ক

পরিবারের
সকলের পক্ষেই ভালো

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

CMC-12 BEN.

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—
"কাপড়ের মাপে কোট তৈরী করুন" ;
কিন্তু সঠিক মাপে কাপড় নিয়ে কোট
তৈরী ক'রে দেখুন—কাপড়টি যদি
'স্যানফোরাইজড' না হয় তো খাটো হয়ে
যেতে পারে। সুতী কাপড় কেনার
সময় যদি কাপড়ের প্রতি গজে কিংবা
সুতীর রেডিমেড পোশাকে
'স্যানফোরাইজড' লেবেল দেখে কেনেন
তাহলে যতবারই কাচুন না কেন
কখনো খাটো হবে না।

লেবেলে

ছাপ দেখে নিলে

সে-কাপড়ের পোশাক কখনো খাটো হবে না!

'স্যানফোরাইজড' রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্কের স্বত্বাধিকারী ক্লুয়েট, পীবডি এণ্ড কোং, ইনকর্পোরেটেড (সীমিত দায়িত্ব সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ) কর্তৃক প্রকাশিত। এই কোম্পানীর সঙ্কুচনরোধী কঠিন শর্তানুযায়ী তৈরী কাপড়েই কেবল 'স্যানফোরাইজড' ট্রেড মার্ক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।

সবিশেষ খবরের জন্য: 'স্যানফোরাইজড' সার্ভিস, ৯৫, মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই-২

SAN.58.3 A BEN

দুটি বড়ো লাভ

মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ
আমাদের দুটি বড়ো উপকার
করবে। অসংখ্য রকমের ওজন ও মাপ
যে বিভ্রান্তি ও ক্ষতির কারণ হয়,
দেশ, তা থেকে মুক্তি পাবে।
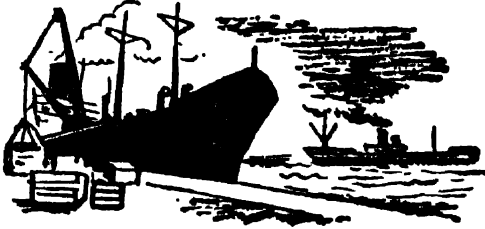
আমরা সেই সঙ্গে পাবো
আন্তর্জ্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত
একটি পদ্ধতি। সমগ্র বিশ্বে এই
মেট্রিক পদ্ধতি স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই দুইমুখীন উদ্দেশ্য সফল করার
প্রথম ব্যবস্থা হোল মেট্রিক ওজন
ব্যবহার করা। বিভিন্ন রাজ্যের
নির্ব্বাচিত অঞ্চলে ও শিল্পে ইতিমধ্যেই
এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

DA-58/433 BEN

ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত
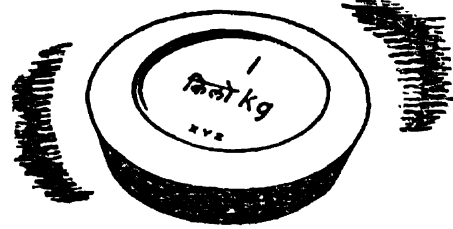
ছোট্ট ছেলেটি তার বোনকে বলছে ঃ
"দেখ্, আমরা যদি মা'র বিছানা
থেকে ডানলপিলোটা
সরিয়ে ফেলতে পারি,
তাহলেই মা আমাদের সঙ্গে
বেশীক্ষণ থাকবেন,
আরো একটা গল্প
শোনা যাবে।
আসলে ঐ ডানলপিলোটার
লোভেই তো মা রোজ
রাত্তিরে অত তাড়াতাড়ি
শুতে যান!"
'মা কেন
তাড়াতাড়ি
শুতে যান ?'
ডানলপিলো
গৃহসুখ শতগুণে
বাড়িয়ে দেয়।
DPC-97 BEN

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৫

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭

খৃষ্টাব্দ

হইতে

ভারতের সেবায়

নিয়োজিত

মওলানা আজাদের কাহিনী

[মওলানা আজাদের ইচ্ছা ছিল যে তিন খণ্ডে তিনি নিজের জীবনী সম্পূর্ণ করবেন। প্রায় দুই বছর আগে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়, এবং তিনি আত্মকথা বলতে শুরু করেন। তিনি উর্দুতে বলে যেতেন, এবং তাঁর কথনের ভিত্তিতে ইংরিজিতে বইখানির রচনা শুরু হয়। দ্বিতীয় খণ্ড তিনি সম্পূর্ণ দেখে এবং অনুমোদন করে যেতে পেরেছিলেন, এবং স্বতন্ত্রভাবে ইংরাজিতে তা প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি প্রথমে কিছুই বলতে চাননি, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড আত্মকথার খসড়া তৈরী হবার পরে প্রথম খণ্ডে ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতেও রাজী হন। প্রথম খণ্ডের জন্য একটি সংক্ষিপ্তসারও তৈরী করা হয়, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা হিসাবে তাকে প্রকাশ করার কথা ঠিক হয়। সেই সংক্ষিপ্তসারের বাঙলা অনুবাদ পূর্বে "চতুরঙ্গে" প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যায় বইখানির আর এক অধ্যায় প্রকাশিত হল। এই সংখ্যার সঙ্গে "চতুরঙ্গে" মওলানা আজাদের কাহিনীর প্রকাশ শেষ হল। সমস্ত বইখানির বাঙলা অনুবাদ পুস্তকাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।—**হুমায়ুন কবির**]

জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল, আসফ আলী, শঙ্কররাও দেও, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া, ডাক্তার সৈয়দ মাহ্মুদ, আচার্য কৃপালনী এবং ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই নয়জন সদস্যকে আমার সঙ্গে আহমদনগরে আনা হয়। রাজেনবাবুও কমিটির সদস্য ছিলেন, কিন্তু তিনি বোম্বাইয়ের মিটিং-এ আসেননি বলে তাঁকে পাটনায় গ্রেফতার করে সেখানেই কয়েদ রাখা হয়।

কেল্লার মধ্যে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। যে দালানে আমাদের রাখা হল, দেখে তাকে ফৌজী ব্যারাক মনে হয়। মাঝখানে প্রায় ২০০ ফিট চওড়া চত্বর, তার চারদিকে কামরা। পরে শুনলাম যে প্রথম যুদ্ধের আমলে সেখানে বিদেশী সৈন্যদের কয়েদ রাখা হয়েছিল। পুণা থেকে একজন জেলর আসলেন এবং আমাদের সঙ্গে যে সব জিনিসপত্র এসেছিল, সেগুলি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। একটি ছোট্ট ভ্রাম্যমান রেডিও আমি সর্বদাই সঙ্গে রাখতাম। সব জিনিস আমার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল বটে, কিন্তু রেডিও সেটটি আটক করে রাখল। যতদিন বন্দী ছিলাম, ততদিন আর রেডিওটির দেখা পাইনি।

একটু পরেই লোহার সানকি করে আমাদের খাবার দেওয়া হল। খেতে মোটেই ভাল লাগল না, এবং জেলরকে আমি বললাম যে চীনাবাসনে খাওয়া আমাদের অভ্যাস। জেলর দুঃখপ্রকাশ করে বললেন যে তখন তখুনি বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, কিন্তু পরদিন

সে সব ঠিক হয়ে যাবে। পুণা থেকে একজন কয়েদী এসেছিল—তাকেই আমাদের বাবুর্চি নিয়োগ করা হল। সে যে ভাবে রাঁধত তা আমাদের পছন্দ হত না। কয়েকদিন পরে তাকে বদলে আর একজন বাবুর্চি আনা হল, কিন্তু এ নতুন বাবুর্চিও বিশেষ সুবিধার হল না।

আমাদের কোথায় আটক রাখা হয়েছে সরকার সে কথা গোপন রাখতে চাইলেন। এরকম ঢাকাঢাকি করবার চেষ্টাকে বেওকুফী মনে হল, কারণ এরকম খবর বেশীদিন লুকিয়ে রাখা যায় না। গভর্ণমেণ্টের এ সিদ্ধান্তে আমি কিন্তু আশ্চর্য হইনি—বোধ হয় সকল গভর্ণমেণ্টই এরকম ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। দু-তিনদিন পরে বোম্বাই প্রদেশের জেলের ইন্সপেক্টর জেনারেল আমাদের দেখতে এলেন। তিনি বললেন যে সরকারের হুকুম যে আমরা আত্মীয় স্বজনকেও চিঠি লিখতে পারব না, তাঁরা যদি লেখেন, তবে সে চিঠিও আমাদের দেওয়া হবে না। কোন খবরের কাগজও আমরা পাব না। ইন্সপেক্টর জেনারেল এ সব কথা জানাতে লজ্জা পাচ্ছিলেন, কিন্তু বললেন যে সরকার কড়া হুকুম দিয়েছে এবং সে আদেশ তাঁকে পালন করতেই হবে। অন্য কোন বিষয়ে আমাদের কোন অনুরোধ থাকলে তিনি তা পালন করবার চেষ্টা করবেন।

তেশরা অগস্ট আমি যখন কলকাতা থেকে বোম্বাই রওয়ানা হই, তখনই আমার শরীর বেশী ভাল ছিল না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের সময়েও আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছিলাম। সরকারের এ সব কথা জানা ছিল। ইন্সপেক্টর জেনারেল নিজে চিকিৎসক ছিলেন—তিনি তাই আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে চাইলেন, কিন্তু আমি রাজী হলাম না।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের কোন যোগই রইল না, সেখানে কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমরা একেবারে অন্ধকারে রইলাম। স্বাস্থ্য এবং মনোবল বজায় রাখবার জন্য দৈনন্দিন কাজের প্রোগ্রাম করতে হবে একথা আমরা সবাই বুঝলাম। আগেই বলেছি যে চত্বরের চারিদিক ঘিরে আমাদের ঘর ছিল। এক লাইনের প্রথম ঘরে আমি থাকতাম। আমার পাশে জওহরলাল এবং তার পরের ঘরে আসফ আলী এবং সৈয়দ মাহমুদ থাকতেন। লাইনের শেষ ঘরটি ছিল আমাদের খাবার ঘর, সকালে আটটায় নাস্তার জন্য এবং বেলা এগারোটায় মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সবাই সেখানে জমা হতাম। খাওয়ার পরে আমার ঘরে আড্ডা বসত এবং ঘণ্টা-খানেক ঘণ্টা দুয়েক নানা বিষয়ের আলোচনা হত। তারপরে যে যার ঘরে গিয়ে খানিকটা বিশ্রাম করতাম এবং বিকেল চারটায় সবাই আবার চায়ের জন্য একত্র জড় হতাম। রাত্তিরে আটটায় খেতে বসতাম, কিন্তু আলাপ আলোচনা রাত দশটা পর্যন্ত চলত। তারপরে যে যার ঘরে চলে আসতাম।

আমরা যখন পৌঁছই, তখন চত্বরটি একেবারে খালি ছিল। জওহরলাল বললেন যে সেখানে ফুলের বাগান করতে হবে। তাতে আমাদেরও পরিশ্রম হবে এবং জায়গাটিও সুন্দর হয়ে উঠবে। তাঁর কথা আমাদের পছন্দ হল। সুপারিনটেনডেণ্টকে বীজের জন্য পুনায় লিখতে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে যত্ন করে কেয়ারী তৈরী করতে শুরু করলাম। এসব কাজে জওহরলালই ছিলেন অগ্রণী। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ রকমের বীজ বোনা হল। যত্ন করে আমরা রোজ জল দিতাম। আগাছা বেছে কেয়ারী পরিষ্কার করতাম। যখন চারাগাছগুলি গজাতে শুরু করল, আমরা তন্ময়চিত্তে তাদের বিকাশ ও বৃদ্ধি দেখতে শুরু করলাম। শেষে যখন ফুল ফুটল, তখন সমস্ত চত্বরটি আনন্দে ও সৌন্দর্যে ভরে উঠল।

দিন পাঁচেক জেলে কেটেছে এমন সময় একজন নতুন কর্মচারীর আবির্ভাব হল। শুনলাম যে আমাদের দেখাশোনা করবার জন্য তাঁকে জেল সুপারিনটেনডেণ্ট নিয়োগ করা

হয়েছে। তিনি থাকতেন শহরে, কিন্তু রোজ সকাল আটটায় জেলে পেঁাছতেন এবং সন্ধ্যায় শহরে ফিরে যেতেন। তাঁর নাম জানতাম না, তাই ঠিক করলাম যে আমরাই তাঁর নামকরণ করব। আমার মনে পড়ল যে চাঁদবিবিকে যখন এই আহমদনগর কেল্লাতেই আটক করা হয়েছিল, তখন চিতা খাঁ বলে একজন হাবশী জেলরের তত্ত্বাবধানে তিনি বন্দী ছিলেন। আমি প্রস্তাব করলাম যে আমাদের সুপারিনটেনডেণ্টকে চিতা খাঁ নাম দেওয়া হোক। সঙ্গীরা সবাই রাজী হয়ে গেলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সকলেই সুপারিনটেনডেণ্টকে চিতা খাঁ বলে ডাকতে শুরু করলেন। তিন চারদিন পরে যখন জেলর এসে আমাদের বললেন যে চিতা খাঁ আজ সকাল সকাল শহরে ফিরে গেছেন, তখন আমি প্রথমে একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম।

চিতা খাঁ নামেই আমি তাঁর কথা বলব। জাপানীরা যখন আন্দামান দ্বীপ আক্রমণ করে দখল করেন, তখন চিতা খাঁ পোর্ট ব্লেয়র শহরে ছিলেন।

২৫শে অগস্ট আমি বড়লাটকে চিঠি লিখলাম। তাতে লিখলাম যে সরকার যে আমার সাথীদের এবং আমাকে বন্দী করা প্রয়োজন মনে করেছেন, সেজন্য আমার কোন অভিযোগ নেই। আমাদের প্রতি সরকারের যে ব্যবহার তা নিয়ে কিন্তু আমার আপত্তি রয়েছে। চুরি ডাকাতি বা অন্য অপরাধে যারা সাজা পায়, তাদেরও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। আমাদের বেলা কিন্তু এ অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমি লিখলাম যে দু সপ্তাহ অপেক্ষা করেও যদি এ বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাই, তবে সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের ভবিষ্যত কর্তব্য নির্ধারণ করব।

১০ই সেপ্টেম্বর চিতা খাঁ এসে জানালেন যে সপ্তাহে একবার আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি লিখবার অধিকার আমাদের দেওয়া হয়েছে। রোজ একখানি দৈনিকপত্রও আমাদের দেওয়া হবে। দেখলাম যে আমার টেবিলে এক কপি টাইমস অব ইণ্ডিয়া রাখা হয়েছে। তখন থেকে নিয়মিতভাবে কাগজ পেতে লাগলাম। সেদিন রাত্তিরে বহুক্ষণ ধরে যত্ন করে কাগজটি পড়লাম। এক মাসের বেশী পৃথিবীর কোন খবর পাইনি। আমাদের গ্রেপ্তারের পরে দেশে কি ঘটেছে, বিশ্বযুদ্ধের গতিই বা কোন দিকে—এতদিন পরে সে-খবর আমাদের মিলল।

পরদিন চিতা খাঁকে গতমাসের খবরের কাগজ পাঠাতে বললাম। সরকার যখন নিয়মিতভাবে আমাদের দৈনিকপত্র দিতে রাজী হয়েছেন, তখন আমার প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি থাকা উচিত নয় বললাম। চিতা খাঁ আমার কথা মানলেন এবং দু তিন দিনের মধ্যেই আমাদের গ্রেপ্তারের তারিখ থেকে টাইমস অব ইণ্ডিয়ার বিগত সংখ্যার একটা পূর্ণ ফাইল আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

আমাদের গ্রেপ্তার করলে দেশে নানা গোলযোগ হবে ভেবেছিলাম—কাগজ পড়ে দেখলাম যে হয়েছেও তাই। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাঙালা দেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বোম্বাই অগ্রণী ছিল। যাতায়াত এবং তার টেলিফোনের ব্যাঘাত ঘটেছে, অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও থানা আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেল স্টেশনও কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রান্ত হয়েছে, বিনষ্ট হয়েছে। বহু মিলিটারী লরী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। ফ্যাক্টরী বন্ধ হওয়ায় রণসামগ্রীর উৎপাদন বন্ধ হয়েছে বা কমে গিয়েছে। এক কথায় সরকারের যে হিংস্র দমননীতি, দেশ সমান হিংস্রতার সঙ্গেই তার বদলা নিয়েছে, অহিংস প্রতিরোধ করে দেশ ক্ষান্ত হয়নি। এ রকমই হবে ভেবেছিলাম, এবং গ্রেফতারের আগে আমাদের কর্মীদের এই ধরনের উপদেশই দিয়েছিলাম।

১৯৪২ সালের বাকী মাসগুলি মামুলীভাবেই কেটে গেল—উল্লেখ করবার মতন বিশেষ

কোন ঘটনা ঘটেনি।

১৯৪৩ সালের গোড়াতেই কিন্তু আবহাওয়া আবার বদলে গেল। ফেব্রুয়ারী মাসে খবরের কাগজ মারফৎ জানলাম যে গান্ধীজী বড়লাটকে লিখেছেন যে একুশ দিনের জন্য তিনি অনশন করবেন। আত্মশুদ্ধির জন্য উপবাস করবেন, এই কথাই তিনি বলেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে দুটি কারণের জন্য গান্ধীজী এ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেছেন। আমি আগেই বলেছি যে গান্ধীজী ভাবেন নি যে ভারত সরকার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে এত তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করবেন। তিনি এ আশাও করেছিলেন যে অহিংসভাবে নিজের ধারণা অনুযায়ী আন্দোলন গড়ে তুলবার সময় তিনি পাবেন। তাঁর এ দুটি ধারণার কোনটিই কার্যকরী হল না। যা কিছু ঘটেছিল, তিনি তার পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করলেন এবং তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কৃতকার্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই তিনি অনশন করবেন বলে স্থির করলেন। এ ভিন্ন অন্য কোন কারণে গান্ধীজীর সিদ্ধান্তের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই নি।

সরকার কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীজীর কাজের বিচার করলেন। তাঁরা ভাবলেন যে গান্ধীজীর যে বয়স এবং তাঁর স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাতে একুশ দিন অনশন করলে তাঁর বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। তাঁদের মতে অনশন করার অর্থ নিশ্চিতভাবে মৃত্যুবরণ। একথাও তাঁরা ভাবলেন যে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যও তাই,—তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে ভারত সরকারকে তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী করতে চান। পরে জেনেছিলাম যে সরকার সে সময় যা কিছু করেন, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই করেছিলেন। অনশনের শেষে গান্ধীজী আর বেঁচে থাকবেন না, এই ধারণা অনুসারে তাঁর মৃতদেহ দহনের জন্য চন্দন কাঠের ব্যবস্থাও সরকার করেছিলেন। সরকার সিদ্ধান্ত করলেন যে গান্ধীজী যদি তাঁর মৃত্যুর জন্য সরকারকে দায়ী করতে চান, তবে সরকার সে দায়িত্ব মেনে নেবেন, নিজেদের কার্যক্রম বদলাবেন না; আগা খাঁ প্রাসাদের মধ্যেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে চিতাভস্ম তাঁর ছেলেদের দেওয়া হবে।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সরকারকে লিখলেন যে গান্ধীজীর উপবাসের সময় তিনি তাঁর চিকিৎসক হিসাবে উপস্থিত থাকতে চান। সরকার তাতে কোনো আপত্তি করলেন না। উপবাসের মেয়াদের মধ্যে একসময় মনে হয়েছিল যে সরকারের হিসাবই বুঝি ঠিক হবে। গান্ধীজীর চিকিৎসকেরা একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন। গান্ধীজী কিন্তু সরকারের হিসাব এবং চিকিৎসকদের আশঙ্কা ভ্রান্ত প্রমাণ করে বেঁচে রইলেন। কষ্ট সহ্য করবার তাঁর যে অসাধারণ ক্ষমতা, এবার তা আরো বিস্ময়করভাবে প্রকাশিত হল। তাঁর মনোবলের কাছে মৃত্যু পরাজিত হল—একুশ দিন পরে তিনি উপবাস ভঙ্গ করলেন।

গান্ধীজীর অনশনের সময়ে যে উত্তেজনা, তাও কিছুদিন পরে স্তিমিত হয়ে এল। তিনি যতদিন উপবাস করছিলেন, আমরা কারাগারের মধ্যে আমাদের অসহায় অবস্থা মর্মে মর্মে অনুভব করছিলাম। আমাদের এ অসহায়তা পরের বৎসর আরো মর্মান্তিকভাবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করলাম।

কয়েক বৎসর থেকে আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ চলছিল। ১৯৪১ সালে আমি যখন নৈনী জেলে আটক ছিলাম, তখন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। যখন মুক্তি পেলাম, ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন যে তাঁর জন্যে হাওয়া বদলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাঁকে রাঁচি পাঠালাম এবং ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে তিনি সেখান থেকে ফিরলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হয়েছিল বটে কিন্তু আমি যখন ১৯৪২ সালের অগস্ট মাসে বোম্বাই রওয়ানা

হই, তখন তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে আবার উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়েছে। ৯ই অগস্ট আমার গ্রেফতারের সংবাদে তাঁর মনে যে ধাক্কা লেগেছিল তার ফলে তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। জেলখানায় তাঁর স্বাস্থ্যের যে খবর পেতাম তা নিয়ে আমার চিন্তার অন্ত ছিল না। ১৯৪৪ সালের গোড়ায় খবর পেলাম যে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ। কিছুদিনের মধ্যে যে খবর এল তা আরো উদ্বেগজনক। ডাক্তারেরা চিন্তিত হয়ে অবশেষে নিজের থেকেই সরকারকে আমার মুক্তির জন্য লিখলেন, একথাও বললেন যে আমার স্ত্রীর বাঁচবার আশা নেই, কাজেই আমাকে মুক্তি না দিলে আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখাও হবে না। সরকার ডাক্তারদের এ চিঠি একেবারে অগ্রাহ্য করলেন। আমিও বড়লাটকে এ বিষয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু চিঠিপত্রের মারফৎ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম না।

এপ্রিল মাসে একদিন চিতা খাঁ দুপুরবেলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এ সময়ে তাঁর আসা একেবারে অপ্রত্যাশিত—পূর্বে কোনদিন এ রকম ঘটেনি। তিনি কিছু না বলে আমার হাতে একটি টেলিগ্রাম দিলেন। টেলিগ্রামটি সাংকেতিক হরফে লেখা কিন্তু তার পাশে ইংরেজী মুসাবিদা ছিল। কলকাতা থেকে তার এসেছে যে আমার স্ত্রীর জীবনান্ত হয়েছে। আমি বড়লাটকে লিখলাম যে সরকার অতি সহজেই আমাকে কলকাতার জেলে বদলী করতে পারতেন, তাহলে অন্তত একবার স্ত্রীর সঙ্গে শেষ দেখা হত। এ চিঠির কোনো উত্তর আমি পাইনি।

তিনমাস পরে আর একটি কঠিন আঘাত আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। আমার বড় বোন আবরু বেগম ভূপালে থাকতেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং দু সপ্তাহ পরে শুনলাম যে তাঁরও মৃত্যু হয়েছে।

এই সময়েই একদিন হঠাৎ খবরের কাগজে পড়লাম যে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কেন যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল তার কারণ তিনি নিজে ঠিক বুঝতে পারেন নি বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁর বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হয়েছে বলেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। পরবর্তী ঘটনার বিচার করলে বোঝা যায় যে তাঁর এ ধারণা ঠিক ছিল না। অনশনের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সে সময় থেকে একের পরে অন্য ব্যাধিতে তিনি অনবরত ভুগছিলেন। পুনার সিভিল সার্জেন তাঁকে পরীক্ষা করে রায় দিলেন যে তাঁর আর বেশীদিন বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। দীর্ঘদিন অনশনের প্রতিক্রিয়া সহ্য করবার শক্তি তাঁর আর ছিল না, কাজেই এখন যে কোনো সময়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। বড়লাটের কাছে যখন এ রিপোর্ট পৌঁছল, তিনি স্থির করলেন গান্ধীজীকে খালাস করে দেবেন। তাহলে গান্ধীজীর মৃত্যুর জন্য আর সরকারকে দায়ী করা চলবে না। তাছাড়া রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার ফলে গান্ধীজীর কার্যক্রমে ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। যুদ্ধের শঙ্কটজনক অবস্থা ততদিনে দূর হয়ে গেছে, মিত্রপক্ষের জয় কেবলমাত্র সময় সাপেক্ষ। সরকারের একথাও মনে হল যে কংগ্রেসের সমস্ত নেতাই তখন জেলে, কাজেই গান্ধীজী একা আর বিশেষ কি করবেন? বরঞ্চ তাঁর উপস্থিতিতে যে সমস্ত দল বা ব্যক্তির সহিংস আন্দোলনের দিকে ঝোঁক ছিল, তাদের কার্যক্রম খানিকটা প্রশমিত হবে।

মুক্তির পরে কিছুদিন গান্ধীজী এত অসুস্থ ছিলেন যে সক্রিয়ভাবে কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুয়েকমাস তো চিকিৎসাই চলল, কিন্তু একটু ভাল হয়েই তিনি কতকগুলি রাজনৈতিক কাজ শুরু করলেন। তার মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলিম

লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য গান্ধীজী নতুন করে চেষ্টা শুরু, এবং সেই উদ্দেশ্যে মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হল যে সরকারের সঙ্গে নতুনভাবে আলাপ আলোচনা করতে হবে। সেজন্য তিনি তাঁর পূর্বের ঘোষিত নীতি বদলে দিলেন। লণ্ডনের "নিউজ ক্রনিকেল" পত্রে তিনি এক বিবৃতি দিলেন যে ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন ঘোষণা করা হয়, তবে ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় ব্রিটিশপক্ষে যোগ দেবে এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ সহযোগিতা করবে। তাঁর বিবৃতি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তাঁর এ দুটি কার্যক্রমই বিফল হতে বাধ্য।

আমার মতে এবার এভাবে মিঃ জিন্নার সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করে গান্ধীজী গুরুতর রাজনৈতিক ভ্রম করেছিলেন। তার ফলে মিঃ জিন্নার রাজনৈতিক মর্যাদা এবং শক্তি আরো বেড়ে গেল এবং পরে তিনি তাঁর ষোলআনা ব্যবহারও করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, প্রথম থেকেই মিঃ জিন্নার প্রতি গান্ধীজীর যে মনোভাব তা বোঝা আমার পক্ষে কঠিন ছিল। ১৯২০ সালের পরে মিঃ জিন্না যখন কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন, তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকখানি কমে গিয়েছিল। সে অবস্থায় গান্ধীজী যা করেছেন এবং যা করেন নি—এ দুই-ই কিন্তু মিঃ জিন্নাকে সাহায্য করেছে এবং প্রধানত গান্ধীজীর জন্যই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে মিঃ জিন্নার পুনপ্রতিষ্ঠা হল। গান্ধীজী না হলে ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে মিঃ জিন্না কোনোদিন এতখানি শক্তিশালী হতেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই মিঃ জিন্না এবং তাঁর রাজনীতিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন যে গান্ধীজী বারবার মিঃ জিন্নার পিছনে ছুটেছেন এবং তাঁকে অনুনয় বিনয় পর্যন্ত করছেন, তখন তাঁদের অনেকের মনেই মিঃ জিন্নার প্রতি এক নতুন অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখা দিল। তাঁরা একথাও ভাবলেন যে সাম্প্রদায়িক সমস্যায় মিঃ জিন্নাই বোধ হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকূল সমাধান আদায় করতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করতে চাই যে গান্ধীজীই প্রথমে কায়েদে-আজম বা মহান নেতা বলে মিঃ জিন্নার পরিচিতি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করে দেন। গান্ধীজীর দলে মিস আমতুস সালাম বলে এক মহিলা ছিলেন। তিনি মানুষ ভাল কিন্তু রাজনৈতিক চালবাজী বোঝার শক্তি তাঁর ছিল না। কোনো এক উর্দু কাগজে মিঃ জিন্নাকে কায়েদে-আজম বলেছে এ কথা তিনি পড়েছিলেন। গান্ধীজী যখন মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চিঠি লিখছিলেন, তখন আমতুস সালাম তাঁকে বললেন যে উর্দু কাগজে মিঃ জিন্নাকে কায়েদে-আজম বলা হয়, কাজেই গান্ধীজীরও তাঁকে কায়েদে-আজম বলে সম্ভাষণ করা উচিত। তাঁর কাজের যে কি ফল হবে সে কথা ভালভাবে বিবেচনা না করেই গান্ধীজী জিন্নাকে কায়েদে-আজম বলে সম্ভাষণ করলেন। কয়েকদিন পরেই তাঁর চিঠি খবরের কাগজে প্রকাশিত হল। ভারতবর্ষের মুসলমান যখন দেখলেন যে গান্ধীজীও মিঃ জিন্নাকে কায়েদে-আজম বলে সম্ভাষণ করছেন, তখন তাঁরাও ভাবলেন যে তিনি নিশ্চয়ই কায়েদে-আজম বা মহান নেতা। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যখন এসব খবর কাগজে পড়লাম, জানলাম যে গান্ধীজী মিঃ জিন্নার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি শুরু করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বোম্বাই যাবেন, তখন সাথীদের আমি বললাম যে গান্ধীজী মস্ত বড় ভুল করছেন। গান্ধীজীর কাজে ভারতীয় সমস্যার সুরাহা হবে না, বরং সমাধান আরো দুরূহ হবে। আমার এ আশংকা যে যুক্তিযুক্ত ছিল, পরবর্তী ঘটনা তাই প্রমাণ করে। মিঃ জিন্না এ সুযোগের পুরোপুরি ব্যবহার করে নিজের নেতৃত্ব আরো মজবুত করে নিলেন, কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতাকে এগিয়ে আনবার

জন্য না করলেন কোনো কাজ, না বললেন কোনো কথা।

সরকারের সংগে সমঝোতার জন্য গান্ধীজী যে দ্বিতীয় কার্যক্রম শুরু করেছিলেন তা-ও সময়োপযোগী হয় নি। পূর্বেই বলেছি যে লড়াই যখন শুরু হয়, তখন বাস্তব এবং সক্রিয় দৃষ্টিভংগী নিয়ে কংগ্রেসের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। সে সময় গান্ধীজীর মত ছিল যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ যতই দরকার হোক না কেন, অহিংস নীতির অনুসরণ তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে যুদ্ধে যোগদান ভিন্ন যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব না হয়, তা হলেও তিনি যুদ্ধে যোগদানের স্বপক্ষে মত দেবেন না। এখন কিন্তু তিনি বলতে লাগলেন যে ইংরেজরা যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন তবে তিনি তাঁদের সংগে সহযোগিতা করবেন। তাঁর পূর্বের ও সাম্প্রতিক মতের এ পার্থক্যের ফলে ভারতবর্ষে এবং বিদেশে নানা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। ভারতবাসীর মনে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিল। বিলাতে তার যে প্রতিক্রিয়া হল তা আরো গুরুতর। ইংরেজদের মধ্যে অনেকের মনেই এ ধারণা হল যে যুদ্ধের ফলাফল যতদিন অনিশ্চিত ছিল, ততদিন গান্ধীজী ইংলণ্ডকে সাহায্য করতে রাজী হননি। এখন মিত্রপক্ষের জয় সুনিশ্চিত দেখে গান্ধীজী ইংরেজের সহানুভূতি অর্জনের জন্য সহযোগিতার প্রস্তাব করছেন, একথাই তারা মনে করলেন। যাঁরা এরকম ভেবেছেন, তাঁরা কিন্তু গান্ধীজীকে একেবারেই বোঝেন নি। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে জয়পরাজয়ের প্রশ্ন গান্ধীজীর মনে কোনো প্রভাবই ফেলে নি। তবু এরকম ধারণার ফলে গান্ধীজীর কথাকে ব্রিটিশ সরকার বিশেষ আমল দিলেন না। গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবের যে প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলেন, তা মিলল না। তার আরেকটি কারণও ছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের সাহায্য ইংরেজের জন্য যতখানি জরুরী ছিল যুদ্ধের অবস্থার উন্নতির সংগে তা রইল না। সেজন্যও তাঁরা গান্ধীজীর প্রস্তাবকে খানিকটা উপেক্ষার চোখেই দেখলেন।

আজ ১৯৫৭ সালে পুরানো এসব ঘটনার কথা লিখতে বসে একটি কথা না বলে পারছি না। গান্ধীজীর যাঁরা ছিলেন নিকটতম শিষ্য, সশস্ত্র বনাম অহিংস আন্দোলনের প্রশ্নের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের মতের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। পূর্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যখন একবার প্রস্তাব করেছিল যে ইংরেজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করলে কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে, তখন সর্দার প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য কৃপালানী এবং ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সে সময় আমাকে যে চিঠি লেখেন তাতে বলেছিলেন যে অহিংস নীতিকে তাঁরা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেয়েও অহিংস নীতি তাঁদের কাছে বেশী বরণীয়। ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, তখন তাঁদের মধ্যে কেউই কিন্তু বললেন না যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন নেই। বরং তাঁরা দাবী করলেন যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে দ্বিধা বিভক্ত করে ভারত সরকারের সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। তখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যিনি সর্বাধিনায়ক, তাঁর প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেই এ দাবী করা হয়। সর্বাধিনায়ক বলেছিলেন যে তিনবছর পর্যন্ত যুগ্ম নিয়ন্ত্রণে যুক্তবাহিনী বজায় রাখা হোক, কিন্তু তাঁরা সে কথায় সায় দেন নি। অহিংস নীতিকে যদি তাঁরা সত্য সত্যই ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাহলে যে ভারত সরকার সৈন্যবাহিনীর জন্য বছরে প্রায় একশো কোটি টাকা খরচ করতেন, সে সরকারে যোগ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হল কি করে? কার্যকালে দেখা গেল যে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সৈন্যবাহিনীর জন্য খরচ কমাবার

বদলে আরো বাড়াতে চান। বর্তমানে ভারত সরকার সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রায় দুশো কোটি টাকা বার্ষিক বরাদ্দ করেছেন।

আমার সব সময়েই মনে হোত যে অধিকাংশ রাজনৈতিক প্রশ্নেই আমার এসব বন্ধু ও সহকর্মীরা নিজেরা চিন্তা করতেন না। তাঁরা ছিলেন গান্ধীজীর ষোল আনা অনুগামী। যখনি কোন সমস্যা আসত, তাঁরা গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁদের কারু চেয়ে আমার কম ছিল না, আজো নেই, কিন্তু বিনা বিচারে গান্ধীজীর সকল কথাই মেনে নিতে হবে এ বিশ্বাস আমার কোনোদিনই ছিল না। ১৯৪০ সালে যে প্রশ্ন নিয়ে আমার এ সব বন্ধুরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে যে সে প্রশ্ন তাঁদের মন থেকে একেবারে মুছে গেল, একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। সৈন্যবাহিনী এবং বিরাট রক্ষা বিভাগ ভিন্ন আজ তাঁরা ভারত সরকার চালাবার কথা মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেন না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধের সম্ভাবনাকেও তারা অস্বীকার করেন নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে একমাত্র জওহরলালই আমার সঙ্গে সে সময় পুরোপুরি একমত ছিলেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তাঁর এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গীরই সমর্থন করেছে বলে আমার বিশ্বাস।

১৯৪৪ সালের জুন মাসে "ডি দিবসে"র রিপোর্ট পড়লাম। তাকে যুদ্ধের সন্ধিক্ষণ বলা চলে। অল্পদিনের মধ্যেই মিত্রপক্ষের জয় সুনিশ্চিত হয়ে দেখা দিল। পৃথিবীর লোকে একথাও বুঝতে পারল যে যুদ্ধের ফলে যে সমস্ত ব্যক্তি ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। মনে হল যে ভবিষ্যতের যে ছবি তিনি দেখেছিলেন, দিনে দিনে তাই বাস্তব হয়ে উঠছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ায় মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী জয়লাভ করে এবার হিটলারের ইয়োরোপীয় শক্তিকেন্দ্র অধিকার করতে এগিয়ে চলেছে। এ পরিণতিতে আমি আশ্চর্য হইনি। অনেকদিন থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল যে প্রথম মহাযুদ্ধের মতন এবারও জার্মানী পূর্ব ও পশ্চিমের দুই রণক্ষেত্রে লড়াই করে মারাত্মক ভুল করেছে। যেদিন হিটলার সোভিয়েট রাষ্ট্র আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত করেন, সেইদিনই তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। জার্মান জাতির অথবা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজের জন্য এখন ধ্বংস এড়াবার আর কোনো উপায় রইল না।

এই সময়ে আমাদের ক্যাম্পে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। চিতা খাঁ এসে একদিন বললেন যে ডাক্তার সৈয়দ মাহমুদের মুক্তির আদেশ তিনি পেয়েছেন। আমরা সবাই খবর শুনে আশ্চর্য হলাম, তাঁর একার জন্য এ সিদ্ধান্ত কেন হল, তা বুঝতে পারলাম না।

কয়েকমাস আগে আহমদনগরে ব্যাপকভাবে কলেরা রোগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। চিতা খাঁ আমাদের কলেরার টীকা নিতে বললেন। জওহরলাল, পট্টভি সীতারামিয়া, আসফ আলী, ডক্টর সৈয়দ মাহমুদ এবং আমি এ পাঁচজনে তাঁর উপদেশ মেনে নিলাম। সর্দার প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, শঙ্কররাও দেও এবং ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ[১]—এ চারজনে বিবেকে বাঁধবে বলে টীকা নিলেন না। টীকার প্রতিক্রিয়ায় আমারও একটু জ্বর হল, কিন্তু ডক্টর মাহমুদ কলেরার টীকা একেবারে সহ্য করতে পারলেন না। প্রায় দু সপ্তাহ ধরে তাঁর বিষম জ্বর লেগে রইল। সবাই তাঁর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লাম এবং স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তায় জওহরলাল ডক্টর মাহমুদের সেবা শুশ্রূষার ভার নিলেন। শেষে তাঁর জ্বর ছাড়ল বটে কিন্তু দাঁতের

[১] বইখানি প্রকাশিত হবার পর ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ বলেছেন যে বিবেকের কারণে নয়, ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী তিনি সেবার টীকা নেননি।—অনুবাদক

মাড়ি থেকে রক্তপড়া কিছুতেই বন্ধ হল না। চিতা খাঁ তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। প্রায় সেরে উঠেছেন এমন সময় তাঁর মুক্তির আদেশ এল। কাজেই স্বাস্থ্যের দরুণ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে একথা মনে করারও কারণ ছিল না। আমরা ভাবলাম যে বোধ হয় এতদিনে সরকারের নীতি বদলাল। এবার সরকার খানিকটা উদারভাবে কাজ করতে রাজী এবং তাই ডক্টর মাহমুদের স্বাস্থ্য খারাপ বলে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে। পরে তাঁর মুক্তির আসল কারণ জেনেছিলাম, কিন্তু এত বছর পরে এ দুঃখকর ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার কোনো সার্থকতা নেই।

নিশ্চিতভাবে না জানলেও আমরা বুঝেছিলাম যে আমাদের কারাবাসের দিনও ফুরিয়ে এসেছে। ১৯৪৪ সালের শেষার্ধে ভারত সরকার স্থির করলেন যে আমাদের সকলকে আহমদনগরে আটক রাখবার আর প্রয়োজন নেই। কয়েকটি কারণে আমাদের সেখানে রাখা হয়েছিল। সরকার ভেবেছিলেন যে আমরা যে আহমদনগরে কয়েদ রয়েছি, সে কথা গোপন থাকবে। তাঁদের এ ভয়ও ছিল যে অসামরিক জেলে আমাদের কয়েদ রাখলে আমরা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারব, সামরিক নজরবন্দীতে তা সম্ভব হবে না। আহমদনগর ক্যাম্প জেলে ইয়োরোপীয় সৈন্যবাহিনীর লোক আমাদের তত্ত্বাবধান করবে, কাজেই তারা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখতে দেবে না। বাইরের সঙ্গে আমাদের কোনো সংস্পর্শ না থাকে তার জন্য যে সরকার কত ব্যস্ত ছিলেন, আহমদনগরে পৌঁছেই আমরা তার প্রমাণ পেয়েছিলাম। যে ব্যারাকে আমাদের রাখা হয়েছিল তার দেওয়ালের ঘুলঘুলি বা স্কাইলাইট দিয়ে কেল্লার প্রাঙ্গণ দেখা যেতো। আমাদের পৌঁছবার আগেই ঘুলঘুলিগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তার পলস্তারা এত নতুন যে আমরা যখন পৌঁছলাম তখনো তা ভেজা রয়েছে। যে সাড়ে তিন বছর আমরা আহমদনগরে ছিলাম, বাইরের একজন ভারতবাসীকেও বোধ হয় দেখি নি। কয়েকবার দালানের ছোটখাট মেরামত করার দরকার হয়েছিল, কিন্তু তার জন্যও ভারতীয় রাজমিস্ত্রী বা মজুর ডাকা হয়নি। এক কথায়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কছেদের ব্যাপারে সরকার সফল হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সরকারের প্রথম উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। আমাদের পৌঁছবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল যে আমরা আহমদনগর দুর্গের জেলে কয়েদ রয়েছি। ১৯৪৪ সালে এ খবর গোপন রাখবারও আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। ব্রিটিশ পক্ষের জয় আসন্ন হয়ে এসেছিল। ভারত সরকার তাই সিদ্ধান্ত করলেন যে সামরিক জেলে আমাদের আটক রাখবার আর প্রয়োজন নেই, নিজের নিজের প্রদেশে বেসামরিক জেলে আমাদের পাঠালে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

প্রথমে গেলেন সর্দার প্যাটেল এবং শঙ্কররাও দেও। তাঁদের পুনা জেলে পাঠানো হল। দিল্লির রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণত বাটালায় রাখা হত, আসফ আলী এখন সেখানে গেলেন। জওহরলালকে প্রথমে এলাহাবাদের কাছে নৈনী জেলে পাঠানো হয়, পরে তাঁকে আলমোড়া নিয়ে যাওয়া হল। যাবার সময় জওহরলাল বললেন, এবার বোধ হয় আমাদের মুক্তির দিন এগিয়ে এসেছে। তিনি অনুরোধ করলেন যে ছাড়া পেয়ে তখুনি যেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক না ডাকি। বিশ্রাম ও মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর একটু সময় চাই বললেন। তাছাড়া তখন তিনি ভারতবর্ষের বিষয় একটি বই লিখছিলেন, বইখানি শেষ করতেও কিছুটা সময় লাগবে।

জওহরলালকে আমি বললাম যে আমারও সেই একই ইচ্ছা। বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য খানিকটা সময় জরুরীভাবে আমার প্রয়োজন। তখন জানতাম না যে, যে অবস্থায় আমরা মুক্তি পাব, তার ফলে তৎক্ষণাৎ প্রবল রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে, বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর আমাদের জন্য বিশ্রামের প্রশ্ন উঠবে না।

আমার বদলীর সময় যখন এল, তখন চিতা খাঁ বললেন যে আমার শরীর ভাল নেই, কাজেই কলকাতার গুমোট ভিজে আবহাওয়ায় থাকা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। বাঙালাদেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শুকনো কোনো জায়গায় আমাকে পাঠানো হবে, এই ছিল তাঁর ইংগিত। একদিন বিকেলে এসে আমাকে তৈরী হতে বললেন। আমার আসবাবপত্র মোটর গাড়িতে রাখা হল। তিনি নিজেই আমাকে নিয়ে চললেন, কিন্তু আহমদনগর স্টেশনে না গিয়ে কয়েক-মাইল দূরে এক গ্রামের স্টেশনে আমাকে নিয়ে গেলেন। আহমদনগর শহর থেকে রওয়ানা হলে খবর তখুনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং সরকার আমার চলাচলের খবর গোপন রাখতে চান বলেই এ ব্যবস্থা হয়েছিল।

আহমদনগর জেলে যতদিন ছিলাম, তার অধিকাংশ সময়ই মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে কেটেছিল। তার ফলে আমার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। যখন গ্রেফতার হই, তখন আমার ওজন ছিল ১৭০ পাউণ্ড (প্রায় দু মন চার/পাঁচ সের)। যখন আহমদনগর জেল ছাড়লাম, তখন আমার ওজন মাত্র ১৩০ পাউণ্ড (এক মন তেইশ/চব্বিশ সের)। একেবারেই খিদে হত না এবং কিছুই খেতে পারতাম না।

আমাকে নিয়ে যাবেন বলে বাঙালা দেশ থেকে এক সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর এসেছিলেন। তাঁর সংগে চারজন কনস্টেবলও ছিল। স্টেশনে পেঁছিবার পরে চিতা খাঁ আমাকে তাঁদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন। আহমদনগর থেকে কল্যাণ হয়ে আমরা আসানসোল পেঁছিলাম। আসানসোলে আমাকে রিটায়ারিং রুমে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে আমার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সরকার এ খবর যতই গোপন রাখতে চান না কেন, কাগজওয়ালারা ঠিক খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। আসানসোলে দেখলাম যে কলকাতা থেকে রিপোর্টার কয়েকজন এসেছেন। এলাহাবাদ থেকে এসেছেন এমন দুয়েকজন বন্ধুকেও সেখানে দেখলাম। স্থানীয় লোকের ভিড়ও বেশ জমে উঠেছিল।

আসানসোলের পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট আমায় অভ্যর্থনা করে আমার কাছে এক ব্যক্তিগত আবেদন জানালেন। তিনি বললেন যে আমি যদি জনসাধারণের সংগে আলাপ করতে চাই তবে তিনি বাধা দিতে পারবেন না, কিন্তু তাহলে তাঁকে সরকারের বিরাগভাজন হতে হবে। জনতাকে এড়িয়ে যদি আমি দোতলায় একটি ঘরে বিশ্রাম করি, তবে তিনি খুবই কৃতজ্ঞ থাকবেন—একথাও আমাকে বললেন। আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে তাঁর ক্ষতি করবার আমার ইচ্ছা নেই। আমি এও চাইনা যে আমার জন্য সরকার তাঁর উপরে অসন্তুষ্ট হোন। কাজেই তাঁর সংগে আমি দোতলার একটি ঘরে চলে গেলাম।

সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন ঢাকার নবাবের আত্মীয়। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই আমার দেখাশোনা করতে লাগলেন। মহিলা আমাকে দিয়ে তাঁর অটোগ্রাফ বই-এ স্বাক্ষর করিয়েও নিলেন। আমার আরামের জন্য দুজনেই যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন।

জানতে পারলাম যে আমাকে বাঁকুড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। বিকেল চারটার সময় ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এল এবং একটু পরেই আমাকে আমার কামরায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মে বিরাট ভিড় জমে গেছে। স্থানীয় লোক ছাড়াও কলকাতা, এলাহাবাদ

এমন কি লক্ষ্ণৌ থেকেও অনেকে এসেছিলেন। দেখলাম যে পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট এবং তাঁর দারোগা দুজনেই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন পাছে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করে। সূর্যের তেজ প্রচণ্ড বলে আমার জন্য তাঁরা একটি ছাতা এনেছিলেন। ইন্সপেক্টর আমার মাথার উপর ছাতা ধরেছিলেন, কিন্তু জনতার কাছ থেকে আমাকে আড়াল করবার জন্য ছাতা ক্রমাগত নীচে নামাতে লাগলেন, অবশেষে ছাতা প্রায় আমার মাথার উপর চেপে পড়ল। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে এভাবে ছাতা দিয়ে ঢেকে রাখলে কেউ আমার মুখ দেখতে পারবে না এবং তাহলে জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই আমায় রেলগাড়িতে তুলে দিতে পারবেন।

কারু সঙ্গে আলাপ করবার আমার বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না, কিন্তু যখন দেখলাম যে কেবল আমাকে দেখবার জন্য কলকাতা, এলাহাবাদ এবং লক্ষ্ণৌ থেকে অনেকে এসেছেন তখন মনে হল যে তাঁদের একবার দেখা না দেওয়া অন্যায় হবে। ইন্সপেক্টরের হাত থেকে ছাতা নিয়ে আমি তা বন্ধ করে দিলাম। জনতা আমাকে দেখে দৌড়ে এল, আমি তাদের বারণ করলাম। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব ছিল, তাই সবাইকে উদ্দেশ্য করে আমি হাসতে হাসতে বললাম, "সুপারিনটেনডেণ্ট এবং ইন্সপেক্টর প্রতি মুহূর্তে বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ছেন, এ দারুণ গ্রীষ্মে আমি তাদের মাথা ব্যথার কারণ হতে চাই না।"

জনতাকে সম্ভাষণ করে আমি গাড়ির কামরায় উঠে পড়লাম, কিন্তু তারা তখন আমার গাড়ি একেবারে ঘিরে ফেলল। প্যাটফর্ম ভর্তি লোক তো ছিলই, অনেকে ঘুরে রেল লাইন ধরে গাড়ির অপর পাশে এসে জমা হলেন। খানিকক্ষণ পরে ট্রেন ছাড়ল এবং সন্ধ্যা সাতটায় আমরা বাঁকুড়া পৌঁছলাম। সেখানকার পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট এবং অন্যান্য অফিসারেরা আমাকে নিয়ে শহরের বাইরে এক দোতলা দালানে পৌঁছে দিলেন।

তখন এপ্রিল মাসের শুরু। দিনগুলি বেশ গরম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন দোতলার বারান্দায় বসতাম, তখন দক্ষিণ বাতাসে চোখমুখ জুড়িয়ে যেত। সকাল সন্ধ্যা তখন বেশ ভালোই, কিন্তু দিনের বেলা গরম একটু বেশীই পড়ত। বাড়িতে বৈদ্যুতিক পাখা ছিল, বরফও মিলত, কিন্তু দুপুরের গরম এত বেশী যে তাতে কুলাতো না। সপ্তাহে একবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। একদিন তিনি বললেন যে সরকারকে লিখেছেন যে আর বেশীদিন আমাকে বাঁকুড়া রাখা ঠিক হবে না। উত্তর পেলেই ঠাণ্ডা কোন জায়গায় যাওয়ার তিনি ব্যবস্থা করবেন।

ভালো বাবুর্চি সহজে মেলে না। বাঁকুড়াতেও প্রথমে ভালো লোক পাইনি, কিন্তু শেষে সত্যিকারের ভালো একজন বাবুর্চি মিলল। তার রান্না আমার এত পছন্দ হয়েছিল যে মুক্তির পরে আমি তাকে কলকাতা নিয়ে এলুম।

আহমদনগরে বন্দী হওয়ার সময় আমার রেডিও সেটটি আটক করা হয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। কয়েকদিন পরে একদিন চিতা খাঁ আমায় বললেন যে আমার রেডিওটি তিনি ব্যবহার করতে চান। আমি আনন্দে সম্মতি দিলাম, কিন্তু যতদিন আহমদনগর ছিলাম, ততদিন আর রেডিওর দেখা পাইনি। যখন বাঙালা দেশে বদলী হলাম, তখন আমার অন্য আসবাবের সঙ্গে রেডিও সেটটিও ফেরত পেলাম, কিন্তু ব্যবহার করতে গিয়ে দেখলাম যে তা নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে আর একটি রেডিও এনে দিলেন— বহুদিন পরে আবার সাক্ষাতভাবে অন্য দেশের খবর শুনবার সুযোগ হল।

এপ্রিলের শেষে খবরের কাগজে পড়লাম যে বাটালা জেলে আসফ আলী গুরুতর পীড়িত। দীর্ঘকাল তিনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন এবং তিনি বাঁচবেন না এই আশঙ্কা দেখা

দিল। সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিল্লি পাঠিয়ে দেবেন স্থির করলেন।

১৯৪৫ সালের মে মাসে লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য লণ্ডন গেলেন। মে মাসের শেষাশেষি তিনি ফিরলেন। জুন মাসে একদিন সন্ধ্যাবেলা রেডিওর খবর শুনছি, হঠাৎ বড়লাটের ঘোষণা প্রচারিত হল যে ব্রিটিশ সরকারের পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য নতুনভাবে চেষ্টা করা হবে। সিমলায় এক রাজনৈতিক বৈঠকে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করা হবে। কংগ্রেস যাতে সে কনফারেন্সে যোগ দিতে পারে সেজন্য কংগ্রেস সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মুক্তি দেওয়া হবে।

পরদিন জানলাম যে আমার সহকর্মীদের ও আমার মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমি রাত নটায় খবর শুনলাম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও খবর শুনলেন এবং রাত দশটায় আমাকে জানালেন যে তখনো কিন্তু আদেশ সরকারীভাবে তাঁর কাছে পৌঁছয় নি, আদেশ পেলেই আমাকে জানাবেন। দুপুর রাতে জেলর এসে বললেন যে মুক্তির আদেশ এসে গেছে। এত রাতে কিছুই করবার ছিল না। পরদিন সকালে ম্যাজিস্ট্রেট এসে আমাকে মুক্তির আদেশ পড়ে শোনালেন। তিনি একথাও জানালেন যে কলকাতার এক্সপ্রেস গাড়ি বিকাল পাঁচটায় ছাড়ে এবং সে গাড়িতে আমার জন্য একখানি ফার্স্টক্লাস কুপে রিজার্ভ করা হয়েছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা থেকে সাংবাদিক দল এসে পৌঁছলেন। স্থানীয় লোকও হাজারে হাজারে আসতে লাগলেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি বিকেল সাড়ে তিনটের সময় একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করলেন। আমি সেখানে সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা দিলাম। সন্ধ্যাবেলা রওয়ানা হয়ে পরদিন সকালে হাওড়া পৌঁছলাম।

হাওড়ায় দেখলাম লোকে লোকারণ্য। বহু কষ্টে কামরা থেকে বেরিয়ে মোটরে উঠলাম। বাঙালা কংগ্রেসের তখনকার সভানেত্রী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত এবং আরো কয়েকজন কংগ্রেস নেতা আমার গাড়িতে ছিলেন। রওয়ানা হচ্ছি এমন সময় দেখলাম যে আমার মোটরের সামনে ব্যাণ্ড বাজছে। শ্রীমতী দত্তকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে আমার মুক্তি উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য ব্যাণ্ড আনা হয়েছে। এ ব্যবস্থা আমার ভালো লাগল না, তাঁকে বললাম যে আনন্দ উৎসবের দিন আসেনি। আমি মুক্তি পেয়েছি বটে, কিন্তু আমার হাজার হাজার বন্ধু ও সহকর্মী তখনো জেলে।

আমার কথামত ব্যাণ্ড থামিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল। হাওড়া পুলের উপর দিয়ে যখন মোটর চলছিল, আমার মন অতীতদিনের মধ্যে ডুবে গেল। তিন বছর আগে যেদিন ওয়ার্কিং কমিটি ও অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মিটিং-এ যোগদানের জন্য বোম্বাই রওয়ানা হয়েছিলাম, সেদিনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ল। আমাকে বিদায় দেবার জন্য আমার স্ত্রী বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসেছিলেন। তিন বছর পরে আজ যখন ফিরলাম, তখন তিনি আর নেই, আমার ঘর আজ শূন্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থের লাইন আমার মনে পড়ল :

> But she's in her grave and oh
> The difference to me.

[সে আজ সমাধিস্থ
আমার কাছে সব তাই বদলে গেছে।]

সঙ্গীদের বললাম যে মোটর ফিরিয়ে নাও—বাড়ি যাওয়ার আগে আমি কবরস্তানে তাঁর কবর দেখতে চাই। ফুলের মালায় আমার গাড়ি ভরে গিয়েছিল। নীরবে ফাতেহা পড়ে একটি মালা তাঁর কবরের উপর রেখে দিলাম।
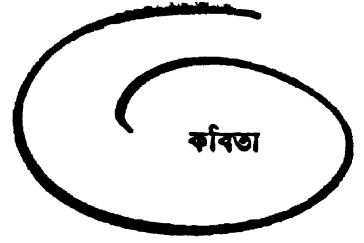
ইস্টিশানে

অরুণ মিত্র

ট্রেন ছেড়ে গেল। ধ্বজপতাকা নিয়ে যারা এসেছিল তারা এবার নুয়ে পড়েছে। লাইন দুটো তাদের চুম্বকের মতো টানছে। কিছুক্ষণ বাদে তারা সম্বিৎ ফিরে পাবে। তখন তারা কাঠের হাত পা মেলে খট খট ক'রে আবার পুরোনো রাস্তা বাজিয়ে চ'লে যাবে।

ট্রেনটা আমার সামনেও দাঁড়িয়েছিল। একটা মৃদু জানলায় সুখদুঃখের অনেক রঙ জমা ছিল! আমি তাতে নিমগ্ন হ'য়ে ছিলাম। হঠাৎ সেই জানলা আর পাশের কপাট ঝড়ে মেতে উঠল এবং সারা কামরাটা কালবোশেখীর মেঘের মতো উধাও হ'য়ে গেল। অন্য কোন্ সমতলের উপর পৌঁছে তা শান্ত হবে জানি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা, তা যেন একবার ভেসে এসে ইস্টিশানের এই কোনায় একটুখানি ছায়া ফেলে।

শেষ একটা কথা ছিঁড়ে দু'টুকরো হ'য়ে গিয়েছিল। তারই আধখানা আমি কুড়িয়ে নিয়ে এখন বুকে গুঁজে রাখছি।

নীরজার ইতিকথা

মণীন্দ্র রায়

যে যাই বলুক, আমি নীরজাকে এই
উচ্ছল আড্ডার স্বাদু সমালোচনায়
জাহান্নামে পাঠাব না; গোপন ঈর্ষার
জ্বালা ঢেকে বিচারের উদার হাসিতে
বলব না : পাতালের শেষ ধাপে নেমেছে সে, আর
তোমরা সবাই গেছ জিতে!

হাঁ, আমি দেখেছি তাকে আউট্রাম ঘাটে, সিনেমায়,
মার্কেটে, ট্যাক্সিতে, বহু পরিবর্তমান পুরুষের
পাশাপাশি; শুনেছি আমিও তার হাসি
বিচূর্ণ কাঁচের শব্দে হাওয়ায় সুতীক্ষ্ণ হ'য়ে ঝরে।
যে ছিল লতার মতো স্পর্শভীরু, কোমল, সে আজ
ডালে ডালে ফণা মেলে ধরে।

তুমি অরুণেশ, বঙ্কু, রাজীব, কানাই,
স্মৃতি কি অতোই ক্ষীণজীবী?
মনে পড়ে সেইদিন যখন মূল্যের পরিমাপে
এদিকে নীরজা একা, অন্যদিকে সমস্ত পৃথিবী!

সে বুঝি বিলাস শুধু, কিম্বা যৌবনের
বন্য অহমিকা তার দলিত পৌরুষ ফিরে পেতে
নীরজার নাম মাত্র খুঁজেছে কেবল!
যে মেয়ে হাসে ও কাঁদে, জীবন্ত যে নিজের বোঁটায়
তার সুষমার চেয়ে দলগুলি ছিঁড়ে নিতে বুঝি
সেদিন মেতেছ হিংস্র প্রতিযোগিতায়।

তাই অরুণেশ তুমি বঙ্কুর হৃদয়ে
বীভৎস; বঙ্কুও পোড়ে রাজীবের মনে;
কানাইয়ের অনিদ্রা তো রাজীব; এবং
সবাই প্রেমের খোঁজে ঘুরে মর ঘৃণার বন্ধনে!

এ নাটকে পরিণাম হল যা হবার।
সবাই পেয়েছ নীরজাকে।

অথচ ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তেও দুঃস্বপ্নের মতো
অন্য কারো চোখ জেগে থাকে!
সে আঁধার তোমাদেরি নিষ্প্রেম হৃদয়।
যে মেয়ে জ্বালাত শত দীপাধার একটি হাসিতে
জনে জনে সেধেছে সে, ফিরে গেছে, শুনেছে কেবল
ও তার উচ্ছিষ্ট প্রেম অচল মাটির পৃথিবীতে!

আজ সে কোথায় দেখ। তোমরা সবাই
পোষমানা জীবনের সুখের আঁচলে
নিরাপদ, ফিরে গেছ ঘরে।
আর ওই উন্মাদিনী নীরজা একাই
নির্মম লোভের দাহে প্রাণ দেবে ব'লে
নেমে গেল আগুনের ঝড়ে॥

জননী

হরপ্রসাদ মিত্র

বহু ভিড়,—আঁকাবাঁকা গলি, শব্দ, মানুষের মুখ,
কেবলি চালাকি আর
জড়, মূঢ় অবসাদ, ভয়!

শরীর হাঁটছে পথ।
পথে পথে এলো স্বর্ণচাঁপা।
বাগান সাজায় কে সে?
হলা মালী নিড়োয় একলা।
ওপরে কী সনাতন, আদিগন্ত, উদাস আকাশ!

জমছে বোধের মূলে জীবনের জটিল জঞ্জাল
যেতে যেতে মনে হয়; তারপরে—
ফটক পেরিয়ে
আরো দূরে যাওয়া, যাওয়া না-দেখায়
প্রত্যহ যেমন!

নীল জল, রাঙা মেঘ, শাদা পাখি—
কোথায়, কোথায়!
হঠাৎ গলিত কুষ্ঠ পা নাড়ছে দেখলুম রুদ্দুরে
হে জননী বসুন্ধরা,
তোমার আশ্চর্য কোল জুড়ে!

ঝড়ে

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

জীবনকে কেন্দ্র করে নানা দুঃখ আছে।
থাবা মেলে আগে-পাছে
হুহুঙ্কারে নেকড়ের মতন
রক্ত-পিপাসায় ফেরে, করে আক্রমণ।
—যেন মৃত্যু-অভিশাপ :
জীবনের সমস্ত সংলাপ
মুছে দেয়, বিবিক্ত চিন্তায়
শ্রান্তি জ্বালা, যন্ত্রণা ঘনায়।
তবু যতটুকু পারি
সন্তাপ-তরঙ্গ দুই হাতে
রুখি—পর্যুদস্ত হই যত না আঘাতে।
তবু যেন কোনো এক অসতর্ক ক্ষণে
বিষাক্ত ফণার আস্ফালনে
শশব্যস্ত আছি—
মৃত্যুর একান্ত কাছাকাছি।

সমুদ্রের মত অন্ধকার
প্রগাঢ় উদ্বেল ঊর্মি ভয়ত্রস্ত আকাশ আমার।
নেই তাতে কোনোই দ্যোতনা
নক্ষত্রের স্বল্প-আনাগোনা।
ইতস্তত আনাচে-কানাচে
শুধুই বিদ্যুৎ-ফণা সমুদ্যত আছে—
অদৃষ্টের আরো কী লাঞ্ছনা?
জীবন বড়ই বিড়ম্বনা:

যখন সম্ভাব্য মৃত্যু অন্ধকারে হাঁটে
বিষণ্ণ মুহূর্তগুলি দ্রুত পাখ্‌সাটে,
নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে তখন ললাটে
কে সে কর রাখে?
দূরে ঠেলে ঝড় ও ঝঞ্ঝাকে?
কেউ নয়, সে স্বপ্ন ছড়ায়।
হৃদয়ের নম্র মমতায়
অন্ধকারে দীপ জেবলে যায়।

সে মুহূর্তে শুধু মনে হয়
যদিও অনন্ত দুঃখ পরিব্যাপ্ত আছে
জীবন তবুও মিথ্যা নয়—
অত্যাশ্চর্য পরম বিস্ময়।

রাত্রি

শেলী

চকিত তন্দ্রার জালে বেঁধে ফেল, হে দেবী শর্বরী,
ক্লান্ত ধরিত্রীরে,
অলখিতে খুলে দাও তোমার মোহন স্বপ্নতরী
পশ্চিমের উত্তাল সমীরে,
কুজ্ঝটি-বিলীন কোনও পূর্বগিরি গুহাতল হতে
ভেসে আসা বাধাহীন ঘন কালো তিমিরের স্রোতে
আভাসি উঠিছে তব তনুখানি অতি সুগোপন
সুন্দর-ভয়াল; দেবী, এস ফেলি চপল চরণ
উদ্বেলিত নীল-সিন্ধু নীরে॥

তারকাখচিত লোল তিমিরের ধূসর-অঞ্চলে
মূরতি আবরি,
দিবসের ক্লান্ত আঁখি ঘনঘোর আকুল কুন্তলে
ছেয়ে ফেল, দাও অন্ধ করি,
বিবশ করিয়া তারে মুহুর্মুহু মুখাসব দানে
তারপরে ক্ষিপ্রপদে ছুটে এস অস্তাচল পানে
নদী সিন্ধু বনভূমি অগণিত নগরী ভ্রমিয়া
পরশি নিখিল অংগ স্বর্ণকান্তি মায়াদণ্ড দিয়া
এস চির বাঞ্ছিতা শর্বরী॥

জাগিনু যখন, হেরি খরতপ্ত অরুণ-কিরণ
মেলিয়া নয়ন,
শিশিরের স্বপ্ন ভাঙি ঝলসিছে গলিত হিরণ
কুসুমের শুকায় জীবন,
কোথা শান্তি? স্নিগ্ধচ্ছায়া? স্নেহ নম্র কোথা অন্ধকার?
অয়ি রাত্রি প্রাণময়ী, দগ্ধ মরু এ নহে আমার,
তোমারে হারায়ে সখি সারা বিশ্ব ফেলে দীর্ঘশ্বাস
তরুর মর্মর মাঝে জেগে ওঠে শ্রান্ত হাহুতাশ
দিশি দিশি আকুল ক্রন্দন॥

তোর ভ্রাতা মৃত্যু আজি মোর পাশে কহিছে আসিয়া,
"বরিবে আমারে?"
নিদ্রা তোর কন্যা কহে স্বপ্নালস কটাক্ষ হানিয়া

মধ্যাহ্নের মধুপ-ঝঙ্কারে,
বাঁধিয়া আমার কণ্ঠ মায়াময় নম্র বাহুডোরে :
"রহিব তোমার পাশে? বরণ করিবে, সখা, মোরে?
তোমারে ঘেরিয়া নব স্বপ্নলোক করিব রচনা।"
আমি কহি "প্রেমে তব নাহি সাধ, না করি কামনা
তোমা সনে গৃহ রচিবারে॥

মরণ ত্বরিত গতি ধরিবে আঁকড়ি মোরে প্রিয়া
তুমি গেলে চলি,
তন্দ্রা সে তুহিন-হিম আলিঙ্গনে আমারে বাঁধিয়া
পড়িবে আমার বক্ষে ঢলি
তোর মুখ পানে প্রিয়া চেয়ে আছি যে-কামনা লাগি
চাহিনা অন্যের কাছে দীনসম লইবারে মাগি
হে রাত্রি, সাধনা মোর এস বক্ষে
বাঁধ আলিঙ্গনে
এস ক্ষিপ্র, এস দ্রুত, এস চারু চপল চরণে
উত্তাল তরঙ্গমালা দলি॥

১৯৫৯　　অনুবাদ : **ইউলিসেজ ইয়ং**

রাত্রির প্রতি

শেলী

অস্ত-সাগর পার হয়ে এস চপল পায়
হে নিশীথিনী!
পূর্ব-অচলে গুহা তব ঢাকা কুহেলিকায়,
দীর্ঘ দিবস নির্জনে সেথা, হে মায়াবিনী,
বুনিলে কি শুধু হর্ষ-ভীতির স্বপন-জাল?
প্রিয় তুমি তাই, তাই তব রূপ এত করাল,
চল-চারিনী!

২

তারকা-দীপ্ত অম্বরে দেহ দিও গো ঢাকি,
মসী-বরণা!
ঘন কুন্তলে অন্ধ করিয়া দিনের আঁখি,

চুম্বনে তার করিও বিবশ, হৃত-চেতনা;
যেও তারপর ভূধর সাগর নগরী বন,
ঘুম-পাড়ানিয়া কাঠি দিয়ে ছুঁয়ে সারা ভুবন,
চির কামনা!

৩

উষার আলোকে না দেখি তোমারে, দীর্ঘশ্বাস
বহিল মোর,
রবিকরাঘাতে টুটিল ধরার শিশির-বাস,
ফুলে পল্লবে মধ্য দিনের ঘনালো ঘোর,
ম্লান হলো ক্রমে ক্লান্ত রবির প্রখর ভাস,
তবু কই, হায়, দিন না ফুরায়! দীর্ঘশ্বাস
বহিল মোর।

৪

তব সহোদর মরণ আসিয়া কহিল ডাকি,
'চাহ আমায়?'
শয়ন-শিয়রে আসিল সুপ্তি ধূসর আঁখি,
তোমারি দুলালি, মধ্য-দিনের মধুপ-প্রায়,
মৃদু গুঞ্জনে প্রশ্ন করিল, 'চাহ কি মোরে?'
'তোমার পাশে কি হবে মোর ঠাঁই'? কহিনু, 'তোরে
চাই না, হায়!'

৫

আসিবে মৃত্যু চিরতরে তুমি যাবে যখনি,
তড়িৎ-গতি;
আসিবে সুপ্তি তুমি পলাতকা হলে, রজনী।
তাদের কারেও জানাব না কভু মোর মিনতি।
শুধু তোমারেই করি নিবেদন বাসনা মম,
এস ত্বরা করি, এস মোর কাছে, হে প্রিয়তম,
তূর্ণগতি।

১৯৩১ অনুবাদ : হিরণকুমার সান্যাল/পরিচয়

রাত্রি

শেলী

সমুদ্র তরঙ্গ পরে ফেলি তব চকিত চরণ
এস তুমি রাতি!
পূর্বের কুহেলি-ঢাকা গুহার তিমির-আবরণ
আশঙ্কা-হাসির জালে স্বপ্নময় আনিয়াছ গাঁথি।
সেথায় বসিয়া দীর্ঘ নিরজন দিবস বেলায়,
মধুর ভীষণ স্বপ্ন রচিয়াছ অবাধ হেলায়,
আন ত্বরা সে স্বপন-পাঁতি।

অপরূপ দেহখানি এস ঢাকি তারা-মালা-গাঁথা
ধূসর বসনে,
আকুল কুন্তল ভারে ছেয়ে দিবসের আঁখিপাতা
বিবশ করিয়া তারে অবিরত অধীর চুম্বনে।
তার পরে যেও তুমি নগরে নগরে দেশে দেশে,
জাদু নিদ্রাদণ্ডে তব সবারে পরশ করি হেসে,
হে বাঞ্ছিতা এস মোর মনে।

যখন হেরিনু আমি ধূসর ঊষারে জেগে উঠে
কাঁদি তোর তরে।
ঊর্ধ্বেশ্বরে দীপ্ত সূর্য, শিশিরের সুখস্বপ্ন টুটে,
দিনের উত্তাপ-ক্লান্ত তরু হতে পুষ্পরাশি ঝরে,
পরিশ্রান্ত দিবালোক যেতে যেতে নাহি যেতে চায়
বারে বারে ফিরে আসে। তোরি কথা জাগে সখি হায়
ক্ষণে ক্ষণে আমার অন্তরে।

মৃত্যু তব ভ্রাতা আসি কহিল ডাকিয়া মোরে যবে,
"চাহ কি আমারে?"
তব শিশু সুপ্তি কহে স্বপন-জড়িত মধু রবে,
—মধ্যাহ্নের নিদ্রালস ভ্রমরের মতো বারে বারে—
"তোমার বুকের কাছে ঘুমায়ে রব কি সারা বেলা,
লবে কি আমারে তুমি?" কহিনু করিয়া অবহেলা
"ফিরে যাও, চাহিনা তোমারে।"

যবে তুমি এ জীবনে আর কভু আসিবে না ফিরে,
আসিবে মরণ।
তন্দ্রা আসে যবে তুমি চলে যাও সমাপ্তির তীরে;—
কারু কাছে চাহিব না, তোর কাছে যাহা চাহে মন
হে প্রিয়া বাঞ্ছিতা মোর! এস রাতি, এস ত্বরা করি
এস সখি, এস ফেলি সমুদ্র তরঙ্গ-শির পরি
স্বপ্নসম চকিত চরণ।

১৯২৫ অনুবাদ : হুমায়ুন কবির/স্বপ্নসাধ

নৈরাজ্যবাদ : প্রজ্ঞানযুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলনকে উপলক্ষ করে ইয়োরোপে ষোল ও সতের শতকে যে ধর্মীয় সংগ্রামের আগুন জ্বলেছিল তাতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মসাম্রাজ্য পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধিতে নূতন রাষ্ট্রবিন্যাসের ভিত্তিস্থাপন হল, ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় মঞ্চে আবির্ভূত হল পোপের এবং পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের কুক্ষিমুক্ত জাতীয় রাষ্ট্র। পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় জাতীয় রাষ্ট্রের অগ্রগতি এবং রাষ্ট্রশক্তির বিস্তার। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল নূতন রাষ্ট্রবাদ। ধর্মরাষ্ট্রের দাবী ছিল তার ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত। জাতীয় রাষ্ট্র তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করল লৌকিক ভিত্তির ওপর। মানুষের আহবানে মানুষের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে, ঈশ্বরের নির্দেশে নয়। সুতরাং রাষ্ট্র অসপত্ন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রজাপুঞ্জের অবিসংবাদী আনুগত্যের অধিকারী। এই দর্শনকে আশ্রয় করে দেড় শ' বছরের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে উঠল সর্বশক্তিমান, জনগণের হর্তাকর্তা, ভাগ্যনিয়ন্তা।

ইতোমধ্যে হারিয়ে যাওয়া মানুষের অনুসন্ধান শুরু হল। উচ্চারিত হল রাষ্ট্রবিধানের প্রতিকূলে ব্যক্তি-অধিকারের বাণী, রাষ্ট্রের এক্তিয়ারের বাইরে জনগণের স্বাধীন সত্তার কথা। আরম্ভ হল রাজদণ্ড ও জনশক্তির সংঘর্ষ। হল্যাণ্ডে স্পেনীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ইংল্যাণ্ডে স্টুয়ার্ট একতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং আমেরিকার উপনিবেশ-বাসীদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এই ঐতিহাসিক সংঘর্ষের তিনটি খণ্ডযুদ্ধ। সংঘর্ষের চূড়ান্ত মীমাংসা হল ফরাসী বিপ্লবে। সর্বগ্রাসী একতান্ত্রিক শাসনের জায়গায় এল গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-অধিকারের আদর্শ।

সতের-আঠার শতকের জনবিদ্রোহ ছিল প্রধানত রাষ্ট্রশাসনের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহীদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন বটে,—তাঁরা রাষ্ট্রের আশ্রিত ধর্ম, বিত্ত এবং স্থিতস্বার্থকেও আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন সফল হয় নি। বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার কিছু কিছু স্বীকৃত হলেও ধর্ম সম্পত্তি ও শ্রেণীস্বার্থ দূর হল না। সর্বত্রই এরা বহাল রইল, কোথাও পুরাতন, কোথাও নূতন মূর্তিতে। সুতরাং আবার শুরু হল তীর্থযাত্রা সাম্য ও স্বাধীনতার অন্বেষণে। ধর্মবিপ্লব আঘাত করেছিল চার্চের কর্তৃত্বকে, রাষ্ট্রবিপ্লব রাষ্ট্রের প্রভুত্বকে। জনগণের বুকে এ দুই বিপ্লব যে আশা জাগিয়ে তুলেছিল তা এর দ্বারা পূর্ণ হয় নি। ধর্মীয় মুক্তির স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসেছিল উগ্রপন্থী এনাব্যাপটিস্টরা। তেমনি রাষ্ট্রীয় মুক্তির স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য জ্যাকবিন দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এনার্কিস্টরা। প্রটেস্ট্যাণ্টরা এক নূতন ধর্মীয় শাসনের অবতারণা করেছিল। জ্যাকবিনরা প্রবর্তন করল এক নূতন সম্পত্তি প্রথা ও শ্রেণী-বিন্যাস। এনার্কিস্টরা নিয়ে এল সর্বনাশা সংহারমন্ত্র। রাষ্ট্রের পোষ্যবর্গের সঙ্গে সঙ্গে তারা ধর্ম, বিত্ত ও শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হল।

এই প্রকারে ফরাসী বিপ্লবের আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে আঠার শতকের উপান্তে মুক্তিপিপাসু এনার্কিস্ট মতবাদের জন্ম হল। সমকালীন প্রজ্ঞানবাদের আবহাওয়ায় লালিত এনার্কিজম প্রাচীন যুগের স্বপ্নসাধ ও মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস বর্জন করে ন্যায়শাস্ত্রে

অধিষ্ঠিত বিচারসিদ্ধ সমাজদর্শনে উত্তীর্ণ হল। প্রজ্ঞানশীল নৈরাজ্যবাদের প্রথম দার্শনিক ইংল্যাণ্ডের উইলিয়ম গডউইন।

৫। ইংল্যাণ্ড : উইলিয়ম গডউইন (১৭৫৬—১৮৩৬)

কেম্ব্রিজশায়ারের উইজবেক নামক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত যাজক পরিবারে উইলিয়ম গডউইনের জন্ম হয়। বাড়ির শুষ্ক ধর্মীয় আবহাওয়া এবং শুচিবায়ুগ্রস্ত পিতার আচরণ তাঁকে ছেলেবেলা থেকে উন্নাসিক করে তুলেছিল। তাঁর আকাঙ্ক্ষা হল যাজকবৃত্তিতে পিতার যশ প্রতিপত্তি তিনি ম্লান করে দেবেন। পিতার বৃত্তি গ্রহণও করলেন তিনি। কিন্তু ১৭৮১ সালে অকস্মাৎ রুশো এল্‌ভেটিয়াস ও ডি হলব্যাক-এর লেখা পড়ে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর সন্দেহ এল। পর বৎসর যাজকবৃত্তিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি লণ্ডনে গিয়ে বসলেন এবং সাময়িক পত্রে এটাসেটা লিখে কষ্টে জীবিকানির্বাহ করতে লাগলেন। এমন সময়ে ১৭৮৯ সালে ঘটল ফরাসী বিপ্লব। তার বিদ্যুৎস্পর্শে গডউইনের জীবন ও চিন্তার মোড় ঘুরে গেল।

অথচ গডউইন সমকালীন চরমপন্থীদের মত উৎসাহ ও আনন্দে আত্মহারা হন নি। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে মনের সংশয় প্রকাশ করেছেন—

> বহু লোক একত্র জড় হইলে তাহাদের মধ্যে যে সকল প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, জনতার সেই উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জবরদস্তির শাসনকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও নিন্দা করিতে কসুর করি নাই। বুদ্ধির সুস্পষ্ট আলোক অথবা হৃদয়ের উন্নত ও উদার অনুভূতি হইতে যে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন আসিতে পারে আমি কেবল তাহাই চাহিয়াছি।[১]

প্রথম হতেই তাঁর চিন্তা ছিল বস্তুবিমুখ এবং প্রজ্ঞানমুখী। কিন্তু এক অনাগত স্বর্ণ-যুগের স্বপ্নে ডুবে থাকবার মত মানুষও তিনি ছিলেন না। তখন বার্কের "রিফ্লেকশন্‌স্‌ অন দি ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন" প্রকাশিত হয়েছে (১৭৯০)। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তিনি যে বিষোদ্‌গার করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল টোরী সরকার তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। পর বৎসর গডউইন এবং কয়েকজন সহযোগীর উদ্যোগে প্রকাশিত হল টমাস পেন-এর "রাইট্‌স্‌ অব ম্যান।" "রিফ্লেকশন্‌স্‌"-এর পাল্‌টা আক্রমণে বামপন্থীদের আরও গুটিকয়েক প্রচারপত্র বেরুল। কিন্তু রাষ্ট্রশাসন ও বিত্তাধিকারে যে মৌলিক বৈষম্য বিদ্যমান এর কোনটিতেই তার নিরসনের চেষ্টা ছিল না। গডউইন স্থির করলেন তিনি এই অভাব পূরণের জন্য একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করবেন। কোন নীতি ও সূত্র আশ্রয় করে একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠিত হতে পারে তা হবে এই গ্রন্থের আলোচ্য। ষোল মাস বসে লেখার পর বই একটি দীর্ঘ শিরোনামা নিয়ে উপস্থিত হল—"এন এনকোয়ারী কনসার্নিং পলিটিক্যাল জাস্‌টিস এণ্ড ইট্‌স্‌ ইনফ্লুয়েন্স অন জেনারেল ভারচু এণ্ড হ্যাপিনেস"। লেখার শুরুতে তিনি ছিলেন বামপন্থী প্রগতিবাদী, লেখার শেষ দিকে হয়ে উঠলেন সর্বশাসনান্তক নৈরাজ্যবাদী।

গডউইন দেখতে পেলেন সমাজের বুকে যে দুঃখবেদনা জমে উঠেছে ভোট দিয়ে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠিয়ে কিংবা খাজনার হার কমিয়ে তার প্রতিকার হবে না। আসল

---

[১] জর্জ উডকক : উইলিয়ম গডউইন, লণ্ডন ১৯৪৬, ৩৪ পৃষ্ঠা।

গলদ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে, বিশেষ করে সম্পত্তিপ্রথা যে অসম সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তার মধ্যে। এদিকে ইংরাজ বামপন্থীদের নজর পড়ে নি। অথচ এই বৈষম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সরকারী শাসন ও স্বৈরাচার। মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে ঢেলে সাজতে হবে এবং তার জন্য রাষ্ট্র ও তার আনুষঙ্গিক কোন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে রেহাই দেওয়া চলবে না।

মানুষে মানুষে সম্বন্ধ কেমন করে ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায় সকল সমস্যার গোড়ায় হল এই প্রশ্ন। জীবনের প্রধান কাম্য সুখ। সকল মানুষের মুখে সুখের পাত্র তুলে ধরা—এই হল ন্যায়ধর্ম। বুদ্ধিমান ও নীতিবান ব্যক্তি যে সুখের আস্বাদ পায় তার সঙ্গে ভোগীর ক্ষণিক ও অনিশ্চিত সুখের তুলনা হয় না। ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত আচরণের দ্বারা মানুষ পরস্পরকে দিতে পারে এই পরম সুখ, দিয়ে নিজেও যথার্থ সুখী হতে পারে। সুতরাং আসল কথা সকলকে ন্যায়বান হতে হবে, কোন ত্যাগ বা আদর্শের খাতিরে নয়, নিছক সুখভোগের তাগিদে। ন্যায়ের বিধান নির্ণয় করবার উপায় মাত্র একটি,—নিজের বিচারশক্তিকে খাটানো।

সমাজ ও আইনের বিধান খাঁটি ন্যায়ের বিধানের পরিপন্থী। আমাদের সমাজজীবনে ছেয়ে আছে এমন সব নীতিবোধ ও নিয়মকানুন যার সঙ্গে ন্যায়ধর্মের সঙ্গতি নেই, যা বস্তুত অন্যায়।

প্রথম, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা। ন্যায়ের বিধান বলে প্রত্যেককে নিজের মত ভালবাসবে। মানুষে মানুষে কোন তফাৎ করা চলবে না। অবশ্য গুণের মর্যাদা দিতে হবে। গুণ ও যোগ্যতা নির্বিশেষে কেহ আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বা উপকারী বলে—সে মা হোক বা স্ত্রী হোক, কৃতজ্ঞতাবশে তার পক্ষপাতিত্ব করতে হবে এ অন্যায় ও অযৌক্তিক। দ্বিতীয়, প্রতিশ্রুতি পালন। কথার দামের চেয়ে ন্যায়ের দাম বেশী।

> যদি আমার বিত্তের প্রতিটি পয়সা, আমার সময়ের প্রতিটি ঘণ্টা, আমার মনের প্রতিটি চিন্তা অমোঘ ন্যায়ের সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহা হইলে এই সব ব্যয় করিবার মত কিছুই প্রতিশ্রুতির এক্তিয়ারে থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমরা কথা দিই বা না দিই, আমাদের ন্যায়ের শাসন মানিতেই হইবে (পৃঃ ১৫১)।

তৃতীয়, শপথ গ্রহণ। সরকারী চাকরিতে শপথ নেওয়া, আদালতে শপথ নেওয়া এসব ভণ্ডামি। শপথ পালনের সঙ্গে ন্যায় ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। সৎ লোক শপথ না নিলেও সৎ, অসৎলোক শপথ নিলেও অসৎ—শপথ নিয়ে কারও চরিত্রের উন্নতি হয় না। চতুর্থ, দেশপ্রেম। বুদ্ধিমান ন্যায়বান ব্যক্তি নিজের দেশের জন্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণের চেয়ে বেশী কিছু চাইতে পারে না।

> সমাজ তৈয়ারী হইয়াছে সভ্যদের কল্যাণ সাধনের জন্য, কীর্তি অর্জন করিয়া ইতিহাসের পাতায় চমক লাগাইবার জন্য নয়। সত্য কথা বলিতে গেলে দেশের প্রতি ভালবাসা একটা মিথ্যা মায়াজাল যাহা জনসাধারণের উপর বিস্তার করিয়া একদল তঞ্চক নিজেদের কূট অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে খুশিমত কাজে লাগায় (৫১৪-১৫)।

গডউইনের অভিধানে ন্যায় সততা ও সত্য সমার্থসূচক। সততাই সুখ। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে সে আনন্দ নেই যা আছে মনের বিস্তারে, সকল অভীষ্ট অপরের সঙ্গে ভাগ

করে নেওয়ায়। সততা এই নিঃস্বার্থ সুখের আধার। "মানব কল্যাণের আকাঙ্ক্ষার নাম সততা" (২৫৫)। মানুষের কল্যাণের পথ, সৎ আচরণের নীতি স্থির হবে বিচার বুদ্ধি দিয়ে। সততা (ভার্চু) এবং সাধুতা (অনেস্টী) করুণা এক জিনিস নয়। সৎ হতে হলে সারা মানবজাতির ভালমন্দ বুঝবার মত শক্তির দরকার, কোন কাজের পরিণামে কি ঘটবে, বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল কতদূর গড়াবে এসব হৃদয়ঙ্গম করবার মত দূরদর্শিতা দরকার। এতদূর চিন্তা করবার ক্ষমতা অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকের নেই তাই সে সৎ হতে পারে না। স্বপ্নবিলাসীরা নিষ্পাপ বর্বর জীবনের যে রঙিন ছবি এঁকেছেন তাতে বাস্তবতার নামগন্ধও নেই। নিষ্পাপ নিরীহ হলেই সৎ হয় না। সততা নেতিবাচক নয়, এর জন্যে চাই বলিষ্ঠ চিন্তাশীল চরিত্র।

> অজ্ঞতা, অসংস্কৃত জীবনের সংকীর্ণ দৃষ্টি এবং অলস অভ্যাস এগুলি যদিও দম্ভ ও ভোগবিলাসের অপেক্ষা কম ক্ষতিকর, তথাপি ইহার মধ্যে সততা একটুও বেশী নাই। সমকালের নির্লজ্জ দুর্নীতি ও নিষ্ঠুর স্বার্থপরতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া কোন কোন মহানুভব ব্যক্তি এক বিশুদ্ধ মানবগোষ্ঠীর সন্ধানে কল্পনার পাখা মেলিয়া উড়িয়া গিয়াছেন নরওয়ের অরণ্যে কিংবা স্কটল্যাণ্ডের শুষ্ক রুক্ষ পার্বত্যভূমিতে। এই কল্পনার জন্ম হতাশা হইতে প্রজ্ঞানশীল দর্শন হইতে নয় (৭২)।

রুশো বুদ্ধিমান সভ্য মানুষকে অভিসম্পাত করে প্রাকৃতিক জীবনের বন্দনা গেয়েছিলেন। গডউইন প্রাকৃত বর্বরতার মোহ ভেঙে দিয়ে বুদ্ধিমান সভ্য মানুষকে তার মর্যাদার আসনে বসালেন।

প্রজ্ঞান থেকে যে সততার উৎপত্তি তার পথ অবধারিত। প্রজ্ঞানের নির্দেশ নির্বিকল্প অদ্বৈত, সুতরাং সততার পথও এক এবং অদ্বিতীয়। সৎ আচরণে বাছাবাছির সুযোগ নেই, ইচ্ছা-অনিচ্ছার অবসর নেই। মানুষ অবস্থার দাস। তার আবার স্বাধীন ইচ্ছা কি? জাগতিক ঘটনায় যেমন কার্যকারণ নিয়মের ব্যত্যয় নেই, নীতির সূত্র এবং যুক্তির ধারাও তেমনি নিয়মিত, তার ব্যতিক্রম হবার যো নেই। চিন্তার কাজ যান্ত্রিক, যদিও অজ্ঞান জড়যন্ত্র থেকে সজ্ঞান জীবযন্ত্রের কাজ পৃথক্।

> আসলে মানুষ সক্রিয় জীব নয়, নিষ্ক্রিয় জীব। আবার অন্য দিক হইতে দেখিলে সে যথেষ্ট উদ্যোগী। তাহার মন খুব পরিশ্রম করিতে পারে যেমন পাহাড় বাহিয়া উঠিবার সময়ে একটা ভারি যন্ত্রের চাকার পরিশ্রম হয়। কঠিন চিন্তার চাপে তাহার দেহ ভাঙিয়া যাইতে পারে। তবু ইহা হইতে তাহার নিষ্ক্রিয়তা অপ্রমাণিত হয় না। এ বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকিলে আমাদের মনে সত্য, ন্যায়, সুখ ও মানবজাতির প্রতি ভালবাসার আলো ক্ষীণ হইয়া যাইবার কথা নয়। আমাদের কাজ-কর্মে থাকিবে দৃঢ়তা ও সরলতা, নিষ্ফল উদ্যমে এবং আফসোসে আমরা নিজেদের ক্ষয় করিব না, শিশুসুলভ অধৈর্যে ব্যস্ত হইব না, সকল ঘটনাকে তাহার পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিব। তারপর এই মতবাদের ভূয়োদর্শন যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়া দিবে তাহার হাতে নিজেদের ধীরভাবে ও নিঃশেষে সমর্পণ করিব (৩১০)।

গডউইনের মতে অপরাধ দণ্ডনীয় নয় কারণ অপরাধীও পূর্বাপর ঘটনার দাস। হত্যার ব্যাপারে আততায়ীর হাতের ছোরার চেয়ে আততায়ীর দায়িত্ব কিছু বেশী নয়।

উভয়েই অবস্থার হাতের পুতুল, নিরুপায়। কার্যকারণের নিয়ম এমনই অব্যর্থ যে জীবনে ব্যক্তির অধিকার বলে কোন বস্তু নেই। অধিকার বলতে বোঝায় বাছাই ও বাতিল করবার সুযোগ। ইচ্ছা হলে আমি এ কাজ করব, ইচ্ছা না হলে করব না, এর জন্যে আমাকে দূষণীয় হতে হবে না—এই হল অধিকার। কিন্তু এমন স্বাধীন বাছবিচারের অবকাশ কোথায়? ন্যায়ের ও যুক্তির নির্দেশ অনন্য, তার বাইরে কোন অধিকার থাকতে পারে না। যদি একজনের মুক্ত হবার অধিকার থাকে অপরের তাকে দাস বানাবার অধিকার নেই। যদি একজনের অপরকে শাস্তি দেবার অধিকার থাকে তাহলে অপরের শাস্তি এড়াবার অধিকার নেই। যদি আমার টাকায় কারও অধিকার থাকে তবে সে টাকা রাখবার অধিকার আমার নেই। সর্বত্র অধিকার স্থির হচ্ছে ন্যায়ের বিধানে, কারও স্বাধীন ইচ্ছায় নয়। বুদ্ধিমান ন্যায়বান মানুষ অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, এবং কর্তব্য কোন অধিকারকে স্বীকার করে না। অপর পক্ষে সমাজেরও ব্যক্তির ওপর কোন অধিকার নেই। ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে তার নিজের বিবেচনায়, সমাজের নির্দেশে নয়।

> কিন্তু তার মানে কি এই যে ব্যক্তির অধিকার আছে সৎ কাজ ছাড়া অন্য কিছু করিবার কিংবা সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছু বলিবার? (১১৯)

সততার অবলম্বন বুদ্ধি, আইন কানুন নয়। হাকিমের শাসনে দুষ্কর্ম বন্ধ হয় না। অসৎ লোকের আইন কানুন এড়িয়ে চলবার ফিকির জানা আছে। তার দুষ্কর্ম রোধ করবার জন্যে সরকার গুপ্তচর লাগাবে। যদি কেউ কর্তব্যের খাতিরে গুপ্তচরবৃত্তি করে তাহলে সরকারী আইনের প্রয়োজন নেই। আর যদি কর্তব্যবোধ না থাকে তাহলে কাউকে দিয়ে এই কাজ করাতে হলে তাকে কোন প্রলোভন দেখাতে হবে। "তাহা হইলে এ উপায়ে তুমি যে দুষ্কর্ম বন্ধ করিবে তাহা অপেক্ষা যে দুষ্কর্ম প্রচার করিবে তাহা কি বেশী বিপজ্জনক নয়?" (৫৮৭)

শাস্তি দিয়ে যেমন অসততা থামানো যায় না, তেমন পুরস্কার দিয়ে সততা বাড়ানো যায় না।

> পুরস্কার বিতরণ করিতে গেলেই সেখানে ভুল, ষড়যন্ত্র ও পক্ষপাতের আশঙ্কা রহিয়াছে। আর তাহা হইলে সততার সমর্থনের বদলে তার বিনাশের ব্যবস্থাই পাকা হইবে। ইহা হইতে কে আমাদিগকে বাঁচাইবে? ইহা ছাড়া পুরস্কার দেওয়া উন্নতি সাধনের অতি দুর্বল উপায়। যেখানে সততা আছে সেখানে কোন পুরস্কার পর্যাপ্ত নয়। যেখানে সততার আবরণ ছাড়া আর কিছু নাই, পুরস্কার সেখানে গিয়া পড়িবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এই প্রকারে বাহিরের ইতর লোভ ও মোহের তাগিদে অন্তরের বোধশক্তি নিয়ত বিভ্রান্ত হয় (৫৮৭)।

সৎ ও অসৎ, সত্য ও মিথ্যা এদের প্রভেদ কিছু জটিল নয়। সহজ বুদ্ধিতে এদের পার্থক্য বোঝা যায়। অন্যায়, অসৎ ও অসত্যের পরিচয় পেতে দেরী হয় না। এদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবেই। এদের পরিণাম যে অশুভ তা জানা যাবেই। মিথ্যা স্বভাবত ক্ষীণজীবী। সত্যেব ধর্ম নিজেকে বিস্তার করা। তার পথে বাধা সৃষ্টি করে বাইরের আইন কানুন আর শাস্ত্রকারদের কচকচি। এই সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে মেলে ধর, সত্যের জয় হবে অবশ্যম্ভাবী।

সত্যের জয়যাত্রায় তাড়াহুড়া নেই, সে ধীরগতি দীর্ঘসূত্রী। জোর জবরদস্তি করে তাকে এগিয়ে নেওয়া যায় না। সে তোমার কাছে কাজ চায় না—সে নিজের কাজ নিজেই

বোঝে। সে শুধু চায় তুমি তাকে প্রকাশ কর, প্রচার কর। সত্যের রূপ মেলে ধর, মানুষের বুদ্ধির দুয়ারে তাকে পেঁছে দাও তাই যথেষ্ট।

> আমি হিংসা দ্বারা মানুষের বিধানকে বদলাইতে চাই না, আমি যুক্তি দ্বারা মানুষের ভাবনাকে বদলাইতে চাই। দল পাকানো আমার কাজ নয়। আমার কাজ সত্যকে প্রচার করা, আর মানুষের অন্তরে তার ধীর অগ্রগতির অপেক্ষা করা (৮৮১)।

শেষে একদিন যখন সকলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে তখন সকল বন্ধন আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে। সারা মানবজাতির জাগ্রত চেতনার সামনে দাঁড়াবার সাধ্য কোন দুশমনের থাকবে না।

বলপ্রয়োগ সর্বত্র অবৈধ, সৎ উদ্দেশ্য হলেও। মানুষের বুদ্ধিতে আবেদন করে তাকে পথ দেখাতে হবে, জোর জবরদস্তি করে নয়। শহীদ হওয়া বা আত্মবলিদানও একরকম জুলুম। লোককে আমার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিভ্রান্ত না করে যুক্তি দিয়ে বোঝান উচিত। দীর্ঘকাল ধরে সত্যের সেবা করে আমি যে দান রেখে যাব আত্মদানের ক্ষণিক চাঞ্চল্যের দান তার কাছে কিছু নয়।

সরকারের আইন জবরদস্তির আইন। আইন করবার অধিকার সমাজের নয়। সহজ আইন লেখা আছে প্রকৃতির খাতায়, সরকারী দপ্তরে নয়। মানুষের কাজ প্রকৃতির আইনকে আবিষ্কার করা, মতলব মত আইন প্রণয়ন করা নয়। প্রজ্ঞান একমাত্র আইনকর্তা। প্রকৃতির আইনে কত বৈচিত্র্য, কত রূপান্তর! মানুষ তার বিস্তরমান প্রজ্ঞান নিয়ে এই বৈচিত্র্য ও রূপান্তরের পিছনে ছুটে চলেছে। আর সরকারী আইন সেখানে এনে হাজির করেছে শাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি, সচল সমাজকে অচল করে রেখেছে, সমস্ত বৈচিত্র্যকে এক ছাঁচে ঢালাই করেছে। মানুষের বহুবিধ আচরণের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আইনশাস্ত্র এক দুর্বোধ্য জটিলতায় এসে দাঁড়িয়েছে।

> সাধারণ লোকে যাহাতে জানিতে পারে কিসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা চলিবে এই উদ্দেশ্যেই প্রথম আইনের সৃষ্টি হইয়াছিল। আর আজ সারা ইংল্যান্ডে এমন একজন আইনজ্ঞ মিলিবে না যিনি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে আইন-শাস্ত্র তাঁর আয়ত্ত। এ এক গোলকধাঁধা যাহার শেষ নাই (৭৬৯)।

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা আইন করে সম্ভব নয়, সরকারী শাসনের জোরেও সম্ভব নয়। সরকারের হুকুম মানলেই ন্যায়ের জয় হবে এ বড় তাজ্জব কথা। সরকার প্রজার বুদ্ধির কাছে আবেদন করে না, প্রজার ওপর জোর খাটিয়ে সে শাসন চালায়। প্রজার আনুগত্য শাসনের জবরদস্তির প্রতি আনুগত্য, নিজের বুদ্ধির প্রতি নয়।

> নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে যখন আমি দক্ষিণ দিকে যাইতে চাই তখন একটা বন্য জন্তু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে আমি উত্তর দিকে দৌড়াইতে বাধ্য হই। সরকারের বিধান সমর্থন না করিলেও যে আমি তাহা মানিতে বাধ্য হই, ইহাও সেই প্রকার (১৭১)।

মানুষের মন ও সরকারী শাসন বিপরীত-ধর্মী। মন গতিশীল, সরকার স্থানু। সরকার চায় আমাদের চিন্তা করবার দায় থেকে মুক্ত করে জড়ভরত বানাতে। সে চায় আমরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি, ন্যায়অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে আইন মানব, শপথ নেব। নিজের চিন্তাশক্তি অপরের হাতে তুলে দেবার পর কারও আর মনুষ্যত্ব থাকে না।

মানুষ যখন নিজের বোধশক্তির পরামর্শ নেয় তখন সে পৃথিবীর অলংকার। যখন সে বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়া অন্ধ বিশ্বাস ও নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের বশবর্তী হয় তখন সে সকল জন্তুর চেয়ে অনিষ্টকারী।...আত্মসমর্পণ করিবার মুহূর্তে সে হইয়া দাঁড়ায় তাহার পরিচালকের হীন অভিসন্ধি সার্থক করিবার হাতিয়ার। আর তারপর যখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তখন অন্যায় নৃশংসতা ও স্বৈরাচারের প্রলোভন সে এড়াইতে পারে না (১৭৪)।

যে অন্যায় ও মিথ্যা স্বভাবত ক্ষীণজীবী সরকার তাদের বাঁচিয়ে রাখে এই প্রকারে। আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলি সরকারের অনুগ্রহে চিরস্থায়ী হয়। যেমন আমাদের চার্চ, ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান। সরকারী টাকায় একদল ভাড়াটিয়া লোক জনসাধারণকে ভাঁড়িয়ে ধর্মের পথে চালন করবে, মানুষের সুখশান্তি নষ্ট করবার এমন সুন্দর ফন্দি আর কার মাথায় আসতে পারে?

রুটি খাইয়া ঈশ্বরের মাংস খাইতেছি, মদ খাইয়া ঈশ্বরের রক্তপান করিতেছি, এই সব ধারণা এতদিন ধরিয়া রাজত্ব করিতে পারিত না যদি না ইহার পিছনে থাকিত সরকারী কর্তৃত্ব। কয়েকজন যাজকজ্যেষ্ঠ ষড়যন্ত্র করিয়া এক বৃদ্ধকে পোপ নির্বাচন করিল আর নির্বাচনের পরমুহূর্তে হইতে তিনি হইলেন বিশুদ্ধ ও পবিত্র,—এতদিন ধরিয়া মানুষ এ বিশ্বাস পোষণ করিত না যদি না ইহাকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য দান দাক্ষিণ্য ও রাজপ্রাসাদের ব্যবস্থা হইত (৩০)।

মানুষের ঘাড়ে সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে না চাপিয়ে তাকে নিজের বিচারবুদ্ধির হাতে ছেড়ে দাও, দেখবে সে ঠিক সত্যের পথ চিনে নেবে।

তাহলে সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ কি? প্রজার সংগে তাদের সম্পর্কই বা কি? আমরা শুনে আসছি সরকার প্রজাপালনের জন্য। কেহ জোরজুলুম করে সমাজে শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে গেলে সরকার তাকে দমন করবে। তার উদ্দেশ্য হিংসাকে হিংসা দিয়ে দমন করা। কিন্তু হিংসা অন্যায় মানুষ করে বিচারের ভুলে। বিচারের ভুল বুঝিয়ে ভেঙে দেওয়া যায়, জোর করে শোধরান যায় না। মানুষ অবস্থার ফেরে পড়ে অপরাধ করে, আততায়ী তার হাতের ছোরার মতই অবস্থার দাস। পরিবেশকে না বদলিয়ে অপরাধীর শুভবুদ্ধিকে না জাগিয়ে দণ্ডবিধি বিভীষিকার আশ্রয় নেয়। এর মানে নিজের অক্ষমতা জাহির করা।

দণ্ডদাতা যদি তার যুক্তি দিয়া আমাকে তাহার মন মত গড়িয়া লইতে পারিত তাহা হইলে সে নিশ্চয় তাহাই করিত। সে দেখাইতে চায় তাহার যুক্তিগুলি সারবান বলিয়া আমাকে সে শাস্তি দিতেছে। আসলে তাহার যুক্তি অসার বলিয়া সে শাস্তির আশ্রয় লয় (৭০৪)।

আবার কখন কখন করুণা দেখিয়ে সরকার শাস্তি মকুব করে। এ আরও যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি অপরাধ সমাজের ক্ষতিকর হয় তাহলে ক্ষমা অন্যায়, যদি তা না হয় তাহলে শাস্তি ছিল অন্যায়।

আমাকে শুধু তাহাই দাও যাহা না দিলে তোমাকে অন্যায় করিতে হয়। ন্যায়-বিচারের বেশী কিছু চাওয়া আমার পক্ষে এবং তার বেশী কিছু দেওয়া তোমার পক্ষে সমান অসম্মানজনক (৭৮৫)।

ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধির ফলে জেলখানাগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে 'অসৎ কাজের

শিক্ষাশালা'। অবশ্য অপরাধীকে সংশোধন করতে কিংবা অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। তার পক্ষে সমাজের স্বার্থ ও শুভবুদ্ধিই যথেষ্ট।

সমাজ ও রাষ্ট্র এক নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল পরস্পরের সাহায্যের জন্যে। তখন তারা বোঝেনি মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক তাদের ওপর শাসন করবে। এই শাসন যত নষ্টের মূল। মানুষের অগ্রগতি ও স্বাধীন চিন্তা শাসনের চাপে রুদ্ধ। শিক্ষা, যা সর্বাবিধ উন্নতির মূল তাকেও আয়ত্ত করে রাষ্ট্র সকল মানুষের সমীকরণ করতে চায়। মধ্যযুগের চার্চ ও স্টেটের চুক্তির চেয়ে জাতীয় সরকার ও জাতীয় শিক্ষার এই চুক্তি আরো ভয়ঙ্কর। রাষ্ট্রের আর এক অপকীর্তি কথায় কথায় যুদ্ধ ঘোষণা। যাতে সাধারণ মানুষের কোন স্বার্থ নেই এমন সামান্য ঘটনায় পরস্পরের জীবন নেবার জন্যে গোটা জাতিকে উস্‌কে দেওয়া রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের কাজ। গুটিকয়েক লোকের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য গোটা দেশটা রক্তে ভাসিয়ে দেওয়া এদের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকার একটি অপগ্রহ। মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে এ দখল করে বসেছে। মানুষের চেতনা বিকশিত হবার সাথে সাথে যাতে এই অপগ্রহ দূর হয় তাই আমাদের করতে হবে।

তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের স্বরূপ কিছু আলাদা নয়। যথার্থ গণতন্ত্রে প্রত্যেকে আত্মসচেতন, প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধিতে চলে এবং কারও সঙ্গে কারও ভেদ বৈষম্য নেই। কিন্তু গণতন্ত্র বলতে আমরা বুঝে নিয়েছি প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা। পার্লামেণ্টারী প্রথা আদৌ গণতান্ত্রিক নয়। আলোচনা তর্কবিতর্ক খুবই ভাল। তাতে বুদ্ধি খোলে। কিন্তু যখন সকল আলোচনার নিষ্পত্তি হয় ভোটের দ্বারা সংখ্যার জোরে তখন সভ্যদের চরিত্র রসাতলে যায়। যারা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল প্রস্তাব পাস হওয়া মাত্র তাদের তা মেনে নিতে হয়, তার প্রয়োগে সাহায্য করতে হয়। সিদ্ধান্ত যখন ভোটের ওপর নির্ভরশীল হয় তখন আলোচনায় সত্যনিষ্ঠা থাকে না, জানবার সন্ধান করবার প্রবৃত্তি থাকে না। বক্তার লক্ষ্য থাকে সভ্যদের খেয়ালখুশির ওপর, তাদের উত্তেজিত করে স্বপক্ষে আনবার দিকে। ফলে সত্যসন্ধিৎসার জায়গায় আসর জাঁকিয়ে বসে হৈ-চৈ, গালাগালি। সকলেই তালে থাকে বিপক্ষের ওপর এক হাত নেবার। অবশেষে সংখ্যা-গরিষ্ঠরা আইন পাস করে, সত্য দেশছাড়া হয়।

কেনই বা জাতিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা,—একশ্রেণী অন্যের হয়ে ভাববে আর তর্ক করবে অপর শ্রেণী এদের সিদ্ধান্ত নির্বিচারে মেনে নেবে? প্রতিনিধি-ব্যবস্থা চলতে পারে যদি নির্বাচক যথেষ্ট সজাগ হয়, যদি তার প্রতিনিধিকে সর্বদা আপনার বোধশক্তি দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে এবং প্রতিনিধি অযোগ্য হলে তাকে বরখাস্ত করতে পারে। কিন্তু যে এত আত্মসচেতন তার নিজের ভালর জন্যে অপরের ওপর নির্ভর করবার দরকার কি?

গণতন্ত্র বহুর রাজত্ব, অর্থাৎ হুজুগের রাজত্ব। ব্যক্তি বুদ্ধিমান আর সমাজ নির্বোধ। তা যদি না হবে তবে যত মনীষার সৃষ্টি, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ব্যক্তির হাতে হল কেন? সমাজ কেন দর্শনের বই লেখেনি, নীতিশাস্ত্র রচনা করেনি? চিরকাল নূতনের সন্ধানে বেরিয়েছে ব্যক্তি, তার ইঙ্গিতে চলেছে সমাজ। সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের ভুলে যখন সমাজের তোয়াজ করে তখন তার অধঃপতন আরম্ভ হয়।

> কেহ যদি সমাজের নামে কাজ করিতে যায় তখন সে নিজের চারিত্রিক তেজ ও কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। একদল চেলাকে তাহার সামলাইয়া চলিতে হয়, সর্বদা

চেলাদের মতলব বুঝিয়া তাহাদের নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া চলিতে হয়। এইজন্য আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে অত্যন্ত চরিত্রবান প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা রাজনৈতিক জীবনের মেছোহাটায় নামিয়া পড়িবার পর অশালীন জননেতায় পর্যবসিত হইয়াছেন (৫৭৩)।

গণতন্ত্রকে বাতিল করলেও গডউইন তার সারমর্ম সাম্য ও স্বাধীনতাকে সযত্নে রক্ষা করেছেন। সাম্য ও স্বাধীনতার ওপর গড়ে উঠবে ন্যায়ের সম্পর্ক।

বৈষম্যবাদীরা বলে মানুষ পরস্পর সমান হতে পারে না, অসমতা স্বভাবদত্ত। এর উত্তর, বর্তমান বৈষম্য স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম। যখন বিত্তবিভাগ ও রাষ্ট্রশক্তি ছিল না তখন সকলে প্রায় এক স্তরের মানুষ ছিল। এখনও যে অসমতা খুব বেশী তা নয়।

আমরা এক প্রকৃতির ভাগীদার। যে সব কাজ একজনের উপকারে লাগে তাহা অপরেরও উপকারে লাগে। আমাদের বৃত্তি ও অনুভূতিগুলি একজাতীয়, সুতরাং আমাদের সুখ দুঃখ একই প্রকারের। আমরা সকলেই বুদ্ধিমান, বুদ্ধি দ্বারা তুলনা করিতে বিচার করিতে এবং মীমাংসায় পেঁাছাইতে পারি। সুতরাং যে উন্নীত একজনের কাম্য তাহা অন্যেরও কাম্য (১০৬-৭)।

অনেকে আশঙ্কা করে যে সাম্য স্থাপন করতে গেলে স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিতে হবে, সকলকে দাস বানিয়ে এক ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন। মানুষকে ভেড়ার পালের মত খোঁয়াড়ে পুরে আর একসঙ্গে মাঠে চরিয়ে সাম্য আসবে না। সাম্য আনবার জন্যে কোন রকম শাসনের প্রয়োজন নেই, মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করবার দরকার নেই। যে প্রজ্ঞানের অগ্নিকণা সকলের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান তাকে জ্বালিয়ে দিলে, তার আলোয় সকলে পথ চিনে নিলে কোন শাসনের প্রয়োজন হবে না। সাম্য ও স্বাধীনতায় কোন অসঙ্গতি থাকবে না।

এ অজুহাতও শোনা যায় যে সকলে স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়। ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার দোষে কোন কোন জাতির দাসভাব নাকি এত প্রবল যে তাদের মুক্ত করা যায় না। এ যুক্তি কপট। দেশ ও হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যের চেহারা বদলায় না। যা ইংল্যাণ্ডে সত্য তা আফ্রিকায় সত্য। কষ্টের চেয়ে আরাম সবাই পছন্দ করে—কেহ আরামের চেয়ে কষ্ট বেশী চায় কিনা এই তত্ত্ব উদ্ধার করতে বিজ্ঞানী ভূগোল ও তাপমাত্রার খোঁজ নিতে যায় না। স্বাধীনতা ভাল না দাসত্ব ভাল এই তত্ত্বের খোঁজে ভূগোল নিয়ে গবেষণা করা তেমনি হাস্যকর। যখন কর্তারা বুঝিয়ে দেন যে তাঁদের শাসন না মানলে মূর্খ জনসাধারণ পরস্পরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে তখন থেকে দাসত্বের সূচনা হয়। দাসত্বের থেকে দাসভাব আসে যেমন সুস্থ লোককে পাগলা গারদে পুরে রাখলে সে পাগল হয়ে যায়।

ন্যায় ও সত্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা সম্পত্তিপ্রথা।

কোন বস্তুর,—যেমন একখণ্ড রুটির উপর সম্পত্তিগত অধিকার কার? উহার প্রয়োজন যাহার সবচেয়ে বেশী, উহা পাইলে যাহার সবচেয়ে উপকার হইবে তাহার (৭৮৯-৯০)।

একজন বিলাসিতায় ও প্রাচুর্যে ডুবে থাকবে আর একজন হাড়ভাঙা খাটুনিতে দেহপাত করেও অভাবে দিন কাটাবে, একজন যৌথভাণ্ডারে কোন কিছু না দিয়ে আলস্যে সময় নষ্ট করবে আর একজন বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করবার অবসর পাবে না, এর চেয়ে অসম ও অন্যায়

আর কিছু নেই।

> *আমার যাহা আছে তাহা যদি আমার ব্যবহারে লাগে তবে তাহা আমার সম্পত্তি। আমার যাহা আছে তাহা আমার পরিশ্রমের উপার্জন হইলেও যদি আমার ব্যবহারে না লাগে তবে তাহা রাখায় আমার অধিকার নাই (৮৫৭)।*

সম্পত্তি ধনী দরিদ্র উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। বিলাসিতায় ও আলস্যে ধনী তার চিন্তাশক্তি, কর্মশক্তি ও মনের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে, যা যথার্থ মূল্যবান তা ভুলে সে তুচ্ছ বস্তুর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। আর দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার লোভে কিংবা অত্যাচারের ভয়ে তার বিবেক ও ব্যক্তিত্ব ধনীর হাতে তুলে দেয়, ধনীর দাসত্ব বরণ করে নেয়। ধনী ও দরিদ্র কেহই বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সৎপথে চলতে পারে না।

সম্পত্তি ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক শাসন ব্যবস্থা। আইন কানুন, রাজস্বের হার ধনীর সুবিধামাফিক গড়া হয়। কিন্তু রাষ্ট্রশাসন ভেঙে দিয়ে, সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে এই বৈষম্য দূর করা যাবে না। মানুষের কল্যাণচেতনা যখন এই বৈষম্য সম্বন্ধে সজাগ হবে তখন এ কলঙ্ক দূর হবে। ধনী তখন সম্পত্তির ওপর অধিকার খাটাবে না, সম্পত্তিকে তার ন্যাস বলে গণ্য করবে। সে বুঝবে একটি পয়সাও তার খুশিমত খরচ করবার অধিকার নেই, তার ভাণ্ডার থেকে সকলকে ন্যায্য পাওনা দিতে হবে। শুধু সম্পত্তি নয়, মালিক নিজেও জনকল্যাণে নিবেদিত। তার বুদ্ধি, শক্তি, সময়, সামর্থ্য সকলই এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সর্বসাধারণের সুখসুবিধার বিস্তার হয়।

কারও কারও ভয় আছে যে এ সাম্যব্যবস্থা বেশীদিন টিকবে না। স্বার্থপর লোকেরা সমাজের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে আবার সম্পত্তি দখল করে বসবে।

> ধরা যাক আমরা একটা সমাজের পত্তন করিয়াছি যেখানে সকলের প্রয়োজন মিটাইবার মত উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে, যেখানে সকলে পরস্পরকে জানাইয়া দিতেছে কাহার কি চাই, কাহার কি চাই না। এখানে তৎক্ষণাৎ নিজের জন্য কিছু জমাইবার তাগিদ দূর হইয়া যায়। দুর্ঘটনা, পীড়া ও বার্ধক্যের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সঞ্চয় করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ এই সমস্ত দাবীর সারবত্তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই এবং সকলেই ইহা মানিয়া লইতে অভ্যস্ত। কয়েকটি নশ্বর জিনিস ছাড়া আর কিছু আমি বেশী পরিমাণে সঞ্চয় করিতে পারিব না। যেহেতু বিনিময়ের কোন রেওয়াজ নাই সেহেতু যাহা আমি ভোগ করিতে পারিব না তাহা রাখিয়া আমার বিত্ত বাড়িবে না (৮৩৬)।

বিত্তের বৈষম্য দূর হলে সমাজের চেহারা বদলে যাবে। অনাবশ্যক বাহুল্য ও অপচয় বন্ধ হলে পরিশ্রম কমবে। শ্রমিকের জীবনে আসবে অবসর, স্ফূর্তি, মানসিক বিকাশের সুযোগ। প্রতিভা নিযুক্ত হবে মানুষের সেবায়, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তারে। ধনীর কৃপণ দানের ওপর তাকে নির্ভর করতে হবে না। সরকারী চাকুরে, সিপাই, পেয়াদা, কেরানী, জহুরী, দালাল ইত্যাদি পরগাছা ব্যবসায়ীরা সমাজ থেকে উঠে যাবে। অনাবশ্যক ভোগের উপকরণ বাড়ান হবে না। জীবন হবে সাদামাটা নির্লোভ। প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য, সুতরাং প্রাথমিক বৃত্তি হবে কৃষি। বছরের অধিকাংশ সময়ে চাষীর কাজ থাকে না। এই সময়টা সে যদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করে তাহলে গোটা সমাজের অভাব মিটবে। বর্তমানে বিশ জনের মধ্যে একজন পরিশ্রম করে জীবনের রসদ যোগাবার জন্য আর উনিশ-জন সে রসদ ভোগ করে। যদি এই পরিশ্রম সকলকে ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে শ্রমিকের

পরিশ্রম কমে হবে বিশ ভাগের একভাগ। এখন যদি তার কাজ হয় দশ ঘণ্টা তখন হবে আধ ঘণ্টা। বাকি সময় সে নিজের মনের খোরাক যোগাতে ও অপরের সেবায় ব্যয় করতে পারবে।

চাকরি করে বেতন নেওয়া, অবসর গ্রহণের পর পেন্সন নেওয়া এও সম্পত্তির মালিকানার মত দূষণীয়। কারণ এখানেও লোভ এসে সেবাবৃত্তির জায়গা নেয়। অবশ্য সবাইকে বাঁচতে হবে। তার জন্যে দরিদ্র জনসাধারণের তহবিল থেকে টাকা না নিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া ভাল।

> যদি একজনের সাহায্যে না কুলায় তাহা হইলে অনেকে তাহাকে সাহায্য করুক। ইউডেমিডাস তাঁহার মৃত্যুর সময়ে একজন বন্ধুকে কন্যার জীবিকার ভার আর একজনকে জননীর জীবিকার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। সে জীবদ্দশায় এই পন্থা অবলম্বন করুক, নিজের জীবিকার দায় গরীব মানুষের উপর না চাপাইয়া যে উদার বন্ধুরা ভার বহন করিতে প্রস্তুত তাহাদের কাছে হাত পাতা—ইহাই খাঁটি খাজনা আদায়ের পদ্ধতি (৬৭৮)।

সম্পত্তির যুক্তি বন্ধুত্ব ও বিবাহের ওপরও প্রযোজ্য। নিজের ব্যক্তিসত্তা সকলকে বিলিয়ে না দিয়ে কারও প্রতি পক্ষপাত করা অন্যায়। বিবাহের বন্ধন ন্যায় অন্যায়ের দিকে না তাকিয়ে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কায়েম রাখতে চায়। এতে ধরে নেওয়া হয় যে দুজন লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষায় চিরকাল মিল থাকবে, একবার যাকে পছন্দ হয়েছে তাকে বরাবর ভাল লাগবে। এর মত ধাপ্পাবাজি আর নেই। বিবাহ অতি নিম্নস্তরের একচেটিয়া সম্পত্তি প্রথা। সম্পত্তিহীন সমাজ হবে বিবাহবন্ধনমুক্ত।

> এ অবস্থায় নরনারীর সম্পর্ক হইবে অন্য যে কোন বন্ধুত্বের সম্পর্কের মত।... যে নারী তাহার গুণপনা দ্বারা আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করিবে আমি তাহার সান্নিধ্যলাভে যত্নবান হইব।...তারপর বুদ্ধিমান ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন করিবে রমনসুখ উপভোগ করিবার জন্য নয়, প্রজনন কার্য উচিত বলিয়া। কিভাবে তাহারা এ কাজ করিবে তাহা স্থির হইবে যুক্তি ও কর্তব্যের নির্দেশে (৮৫১-৫২)।

সম্পত্তি ও সরকারকে উচ্ছেদ করে সাম্য ও স্বাধীনতাকে আশ্রয় করে এক নূতন সমাজের ইমারত উঠবে। সার্বভৌম কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র দূর হয়ে আসবে বিকেন্দ্রিত বেসরকারী বন্দোবস্ত যেখানে কারও ওপর কারও শাসন চলবে না। প্রথমত জাতীয় রাষ্ট্র ভেঙে নিয়ে স্বতন্ত্র স্বায়ত্ত গ্রাম ও জেলার হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। এরা নিজেদের আইন কানুন নিজেরা গড়বে—আইন হবে যথাসম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত। এরা একটি অস্থায়ী জাতীয় সভা নির্বাচন করবে। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে সভার ডাক পড়বে—যেমন গ্রাম ও জেলাগুলির বিবাদের নিষ্পত্তি, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ। প্রথম প্রথম সভার হাতে কিছু ক্ষমতা থাকবে। ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা কমে আসবে। সভা হবে সার্বজনীন প্রয়োজনে সহযোগিতার ক্ষেত্র। তারপর এক সময়ে জাতীয়তার গণ্ডিও উঠে যাবে। মানুষ হবে এক নিরাজ বিশ্ব-গণতন্ত্রের স্বাধীন নাগরিক।

> এই পাশবিক যন্ত্র যা মানবজাতির সমস্ত অন্যায়ের চিরন্তন উৎস,...যার সত্তায় জড়াইয়া আছে বহুবিধ অপকার, যা একেবারে উচ্ছন্নে না গেলে কোন প্রকারে দূর হইবে না,—সেই রাষ্ট্রশাসন যেদিন বিলুপ্ত হইবে সেই শুভদিনটিকে মানবজাতির প্রত্যেকটি কল্যাণকামী কি আনন্দের সঙ্গেই না সংবর্ধনা করিবে! (৫৭৮-৭৯)

অরাজকতার সঙ্গে একটা বিভীষিকার ধারণা জড়িত আছে। রাষ্ট্রশাসন না থাকলে চারদিকে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হবে—এমন একটা আশঙ্কা অনেকেই পোষণ করে। যদি তা ঘটেও স্বেচ্ছাচারী শাসনের যূপকাষ্ঠে যতলোক বলি হয়েছে অরাজকতায় ততলোক মরতে পারে না। বস্তুত প্রথম প্রথম কিছু প্রাণহানি ও রক্তপাত ঘটলেও ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে যায়। নাশকতার পাগলামি বেশীদিন থাকে না।

কিন্তু ধ্বংসের অরাজকতা থেকে ন্যায় ও প্রজ্ঞানের নৈরাজ্য স্বতন্ত্র বস্তু। মানুষের চিন্তাভাবনার এক আমূল বিপ্লবের ওপর এর প্রতিষ্ঠা। এখানে কারও কোন অভাব নেই, লোভ নেই, সকলেই তুষ্ট। হিংসা নেই তাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে না। অপরাধ নেই তাই আদালত উঠে গেছে। কেহ টাকা জমায় না। মজুর তার শ্রমফল পুরোপুরি ভোগ করে।

> এই সমাজে মানুষ হইবে নির্ভীক, কারণ তাহারা বুঝিবে তাহাদের জীবন লইবার জন্য কোথাও আইনের ফাঁদ পাতা নাই। সে হইবে সাহসী, কারণ প্রত্যেকেই তাহার পরিশ্রমের ন্যায্য পুরস্কার পায় এবং একের অপরিমিত ভোগবিলাসের জন্য অন্যকে ধরাশায়ী করা হয় না। ঈর্ষা ও ঘৃণা দূর হইবে কারণ এই হীন-বৃত্তির উৎপত্তি অন্যায় হইতে। প্রত্যেকে প্রতিবেশীর কাছে সত্য কথা বলিবে কারণ মিথ্যাকথা বলিবার অথবা ধাপ্পা দিবার কোন প্রলোভন থাকিবে না। মনের শক্তি যথাস্থানে অধিষ্ঠিত হইবে কারণ সমস্ত কিছু হইবে ইহার পরিপোষক ও সহায়ক। বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে অবর্ণনীয়...(৪৭১-৭২)

তারপর কল্পনার পাখি পৃথিবীর আকাশ ছাড়িয়ে অজানা নভোমণ্ডলে পাড়ি দিয়েছে।

> যখন ধরাতল আর অধিক লোকসংখ্যা বহিতে চাহিবে না তখনকার মানুষ প্রজনন বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ কর্তব্যের বিচারে ইহা নিষিদ্ধ এবং ভুল করিয়া তাহারা কিছু করে না। অধিকন্তু তাহারা বোধ হয় অমর হইবে। সমাজ হইবে বয়স্কদের, শিশু ও বালকবালিকা থাকিবে না। জন্মমৃত্যু ও পুরুষপরম্পরার গতি স্তব্ধ হইবে এবং সত্যকে প্রতি তিরিশ বছর অন্তর নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করিতে হইবে না (৮৭১)।

সংক্ষেপে বলতে গেলে গডউইনের ন্যায়সূত্র এই রকম দাঁড়ায়। ন্যায়ের লক্ষ্য সাধারণের সুখবিধান। এ সুখ লভ্য নিঃস্বার্থ কর্তব্যপালনে। ধর্ম, আইন, সরকার ও সম্পত্তি তার প্রতিবন্ধক। স্বাধীনতা ও সাম্য হবে ন্যায়সম্মত সমাজের বনিয়াদ। এ সমাজ গড়তে হলে রাষ্ট্রশাসন ও সম্পত্তিপ্রথা তুলে দিতে হবে—বলপ্রয়োগ করে নয়, দল গঠন করে নয়, বিচার ও সমালোচনা করে। মানুষ নির্বোধ নয়। অন্যায় অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ও সরকারী জুলুমের চাপে তার স্বাভাবিক বিচারশক্তি বিহ্বল হয়ে আছে। এ শক্তির উদ্বোধন করা বিপ্লবীর কাজ। এ কাজ ধৈর্যসাপেক্ষ। যখন প্রজ্ঞানশীল ন্যায়বোধ জাগরিত হবে তখন রাষ্ট্র ও সম্পত্তির বিধান ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, আসবে সাম্য ও স্বাধীনতার নিরাজ গণতন্ত্র। শাসনের অভাবে গণতন্ত্র উচ্ছৃঙ্খলতায় মগ্ন হবে না। কারণ মানুষের শাসনের জায়গায় আসবে সত্য ও প্রজ্ঞানের অমোঘ নির্দেশ।

গডউইনের বই ঠিক সময় মত বেরুল। তখন ফরাসী বিপ্লবের হাওয়ায় দেশ গরম, লণ্ডনের অলিগলিতে উগ্রপন্থীদের আখড়া। গডউইনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মন্ত্রীসভায় তাঁকে গ্রেপ্তার করার কথা উঠল। প্রধান মন্ত্রী পিট তাচ্ছিল্য করে বললেন তিন

গিনি দামের বই গরীবরা কিনে পড়বে না এবং তা থেকে বিপ্লব ঘটবার কোন ভয় নেই।[২] গরীবরা যে চাঁদা তুলে এ বই কিনবে এবং ক্লাস করে পড়বে এ তিনি ভাবেন নি। যা হোক টোরী সরকার বেপরোয়া দমননীতি চালাতে লাগলেন। সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মাথার ওপর দেশদ্রোহের পরোয়ানা খাঁড়ার মত ঝুলতে লাগল। বিচারের প্রহসন করে কাউকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে দাঁড়াল নিত্যকার ব্যাপার। গডউইন দমলেন না। একটি প্রচারপত্রে তিনি এই ব্যাজবিচারের মুখোশ খুলে দিলেন। বামপন্থীদেরও তিনি ছেড়ে কথা কইলেন না। রাজনৈতিক সম্মেলন ও ভাষণের অধিকার সংকোচন করে পার্লামেণ্টে যখন কয়েকটি বিল আনা হল তখন তিনি দু পক্ষকেই ধিক্কার দিলেন। দলের খাতিরে মত বিসর্জন তাঁর নীতি-বিরুদ্ধ। এই প্রসংগে তিনি বামপন্থী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। বাম সমিতি লণ্ডন করেসপণ্ডিং সোসাইটীর সংগে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হল।

গডউইনের দর্শনের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা তাঁর জীবনী। বই বিক্রীর টাকায় কয়েক বছর বেশ স্বচ্ছলতায় কাটল। তিনি স্মৃতিকথায় লিখলেন, "আমি এ বিষয়ে সজাগ ছিলাম যে একটি পেনিও নিজের জন্য খরচ করিব না যদি না আমি বুঝি ইহা আমাকে যোগ্যতর জন-সেবক করিয়া তুলিবে।"[৩]

তিন চার বছরের মধ্যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর আস্থা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাঁর বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন কমতে ও শত্রুর সংখ্যা বাড়তে লাগল। এণ্টিজেকবিন রিভিউ নামক রক্ষণশীল পত্রিকায় বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ নিয়ে অত্যন্ত অশ্লীল ও নির্দয় আক্রমণ চলল। শেষে যখন গডউইন নিজে বিয়ে করে বসলেন এবং এমন একজনকে করলেন যাঁর অতীত জীবন এবং রাজনৈতিক মতবাদ তাদের কাছে ছিল সমান নিন্দনীয় তখন তারা কুৎসা রটনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

পলিটিক্যাল জাসটিস পুস্তকে গডউইন যৌন আসক্তিকে গ্রহণ করেছেন, বিবাহকে বর্জন করেছেন। অবাধ যৌন মিলন তিনি চাননি—এটা শত্রুদের অপপ্রচার। তিনি বলেছেন প্রজ্ঞান ও কর্তব্যের খাতিরে বংশ বিস্তার হবে, রমণসুখের জন্যে নয়। স্ত্রীসংগের প্রয়োজন তিনি যথেষ্ট অনুভব করতেন। বই বেরুবার বছর ছয় সাত আগে তিনি এক বোনকে ঘটকালিতে লাগিয়েছিলেন। বোন এক পাত্রী স্থিরও করেছিল কিন্তু পাত্রের পছন্দ হল না। পাত্রীর সংগে সংগে ঘটকীও খারিজ হল। গডউইন স্বয়ং বেরিয়ে পড়লেন দৈত্যপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে। কিন্তু তাঁর জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় কোন কন্যার নিদ্রাভংগ হল না।

অবশেষে তিনি আবদ্ধ হলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী প্রগতিবাদী লেখিকা মেরী উল্‌স্‌টোনক্রাফ্‌ট্‌-এর সংগে। এই মহিলার ভাগ্য প্যারিসে একজন আমেরিকানের সংগে যুক্ত হয়ে পড়েছিল এবং একটি মেয়েও হয়েছিল। গডউইনের সংগে কয়েকমাস পূর্বরাগ চলবার পর তিনি সন্তানসম্ভবা হলেন। গডউইন তাঁকে বিবাহ করলেন। স্মৃতিকথায় গডউইন লিখেছেন তাঁরা সব সময়ে একসংগে থাকেন না—মাঝে মাঝে তাঁরা স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ বরণ করে নেন। একটি পত্রে মেরী তাঁকে লিখছেন :

> বাড়ির আসবাবের মধ্যে স্বামী একটি দরকারী অংশ, অবশ্য যদি সে একটা বিদঘুটে বস্তু না হয়। আমি মনেপ্রাণে চাই তুমি আমার হৃদয়ে গেঁথে থাক, কিন্তু আমি চাই না তুমি সব সময়ে আমার কনুইএর কাছে থাকবে, যদিও এই

---

[২] কেগান পল : উইলিয়ম গডউইন, হিজ ফ্রেন্ডস এণ্ড কনটেম্পোরারিজ, ১৮৭৬, খণ্ড ১, ৮০ পৃষ্ঠা।
[৩] জর্জ উডকক : উইলিয়ম গডউইন, ১০১-২ পৃষ্ঠা।

মুহূর্তে থাকলে খুব মন্দ লাগত না।[৪]

কয়েকমাস পরে প্রসবের সময়ে তাঁর মৃত্যু হল। এক তুমুল বজ্রপাতে যেন গডউইনের জীবন খান খান হয়ে গেল। একদিকে মন অবসন্ন অন্য দিকে ঘর বিশৃঙ্খল। তিনি বুঝলেন পারিবারিক ও দাম্পত্য প্রেম বুদ্ধি ও কর্তব্যের শুষ্ক বন্ধনে বাঁধা পড়ে না। সাথীহারা মন ও লক্ষ্মীহীন ঘর, এদিকে দুটি শিশু ও বালিকা—এ নিয়ে দিন কাটানো কঠিন হয়ে উঠল। আবার সঙ্গিনীর জন্যে মন চঞ্চল হল। স্থানে স্থানে বিমুখ হয়ে শেষে যে ঘাটে তিনি তরী ভিড়ালেন তিনি দুই সন্তানের জননী, এক অশিক্ষিতা বিধবা, স্ত্রীসুলভ আমোদপ্রমোদে আসক্ত। তিনি বলতেন প্রথম পরিণয়ের পর থেকে সাগরস্নান ও জলকেলির বিহার-বিলাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। এই বিবাহে গডউইনের পারিবারিক অশান্তি বাড়ল বৈ কমল না।

গডউইনকে কেবল নিজের বেলায় বিবাহ সম্বন্ধীয় মতবাদ গিলতে হয় নি। গডউইনের গুণমুগ্ধ তরুণ কবি শেলী পত্নী হ্যারিয়েটকে ছেড়ে দার্শনিকের কন্যা মেরীর প্রতি অনুরক্ত হলেন। দুজনে যখন উধাও হলেন তখন আবার চারদিক থেকে এক পশলা কুৎসাবর্ষণ হল। গডউইন শেলীর ওপর চটে গেলেন। শেলীর পুত্রকে রেখে হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করে স্বামীর পথ মুক্ত করে দিলেন। শেলী মেরীকে বিবাহ করলেন তবে গডউইনের রাগ পড়ল, জামাই শ্বশুরের মিলন হল।

এদিকে নতুন গৃহিণী স্বামীকে আর একটি সন্তান উপহার দিলেন। আয় নেই অথচ পাঁচটি মুখের অন্ন যোগাতে হয়। গডউইন একটির পর একটি নাটক আর প্রবন্ধ লিখে চললেন কিন্তু তাতে না আসে পয়সা, না হয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ। বাড়িভাড়া বাকি পড়তে লাগল। শেষে বাড়িওয়ালা তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিল। বন্ধুবান্ধবদের অনুকম্পায় একটা আশ্রয় জুটল। ১৮৩২ সালে পার্লামেণ্ট সংস্কার আইন পাস হবার পর যখন হুইগদল সরকার হাতে পেল তখন তারা পুরানো দিনের বিপ্লবী চিন্তানায়ককে ভুলল না। সাতাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে গডউইন একটি সৌখীন সরকারী চাকরি পেলেন যাতে কোন কাজ করতে হবে না। চল্লিশ বছর আগে সরকারী বেতনভাতার বিরুদ্ধে যখন তিনি কলম চালিয়েছিলেন তখন কি জানতেন যে তাঁর জরাজীর্ণ কপালের ওপর নিয়তি এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ এঁকে দেবে?

গডউইন লিখেছেন অনেক কিন্তু তাঁর পরিচয় একটি পুস্তকে। এই বই তাঁকে খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু যেমন অকস্মাৎ তিনি উঠেছিলেন তেমন অকস্মাৎ পড়ে গেলেন। বিদগ্ধসমাজ তাঁকে এমনই ভুলে গেল যে পলিটিক্যাল জাসটিস প্রকাশের আঠার বছর পরে তিনি জীবিত আছেন শুনে শেলী বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। বিপক্ষের লোকেরা অবিরাম কাদা ছিটিয়ে প্রচার করতে লাগল যে দার্শনিক একটা জঘন্য অসম্ভব মতবাদকে চালাবার জন্যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। কিন্তু কেবল এদের অপপ্রচারে তাঁর খ্যাতি ঢাকা পড়েছিল বললে ভুল হবে। গডউইন নিজেও কম দায়ী ছিলেন না। তাঁর প্রতিভা প্রধান রচনার পর আর অগ্রসর হল না। সে যুগের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, তিনি তার সঙ্গে তাল রাখতেও পারলেন না। যখন সহযোগীরা স্বাধীনতার সংগ্রামে কলম ধরেছিল তখন তিনি বাজে নাটক প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্য নিয়ে

---

[৪] ফোর্ড কে. ব্রাউন : লাইফ অব উইলিয়ম গডউইন, লণ্ডন, ১৯২৬, ১২৫ পৃষ্ঠা।

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজের প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখবার মত ব্যক্তিত্বগুণও তাঁর ছিল না। তাঁর কথাবার্তা ছিল নীরস, চালচলন ছিল উদ্ভট, ব্যবহার আত্মম্ভরী। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপে অথবা তাঁর সংসর্গে কেউ আনন্দ পেত না। তাঁর অন্যতম এক বিদগ্ধ সুহৃদ মন্তব্য করেছেন : "বৈঠকে বসলে হয় গডউইন নিজে ঘুমিয়ে পড়েন না হয় অন্যদের ঘুম পাড়িয়ে দেন।"[৫]

গডউইনের তত্ত্বকে দুদিক দিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে—এক ভবিষ্যত সমাজের নক্‌সা হিসাবে, আর বর্তমান ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনা হিসাবে। অন্যান্য আদর্শবাদীর মত তিনিও রঙিন চশমা পরে ভবিষ্যতের ছক এঁকেছেন। কেবল তাঁর সত্যযুগ আরও আসন্ন নিকটবর্তী। তিনি বিশ্বাস করতেন এক পুরুষের মধ্যে সরকার সম্পত্তি যুদ্ধ ও আইন আদালত উঠে যাবে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে বুদ্ধির জাগরণ অবশ্যম্ভাবী এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সকল সমস্যা মিটে যাবে, সাধ আহ্লাদ আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব এমন কি যৌন বাসনাও বিলীন হয়ে যাবে। ন্যায় ও সততার প্রতিষ্ঠা হবে শুধুমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তির সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকে—কোন প্রকার নৈতিক ও আত্মিক প্রেরণার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের জৈবিক দাবী মিটে গেলে তুষ্ট থাকবেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে এ সকল বস্তুর সংস্থান হবে অনায়াসে। নিজের চেষ্টায় নিজের ব্যবস্থা করে নিয়ে তিনি উদ্বৃত্ত সময় সমাজকল্যাণে নিয়োগ করবেন।

কিন্তু কেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এত অল্পে তুষ্ট হবেন? তাহলে বিজ্ঞানের কাজ কি? মানুষের প্রয়োজনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে আর তার যোগান দিচ্ছে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার। মানবসভ্যতায় বিজ্ঞানের ভূমিকাকে গডউইন বুঝতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন বিজ্ঞানের বলে প্রত্যেকে অপরের সহযোগিতা না নিয়ে নিজের নিজের রসদ যোগাতে পারবে, জীবিকার প্রয়োজনে কাউকে যৌথ উদ্যোগের ওপর নির্ভর করতে হবে না, প্রত্যেকে হবে স্বাবলম্বী। আসলে বিজ্ঞানের কাজ ঠিক এর বিপরীত। বিজ্ঞান ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে ক্রমশ মানুষের পরস্পর-নির্ভরতা ও সহযোগিতার আসর বাড়িয়ে চলেছে। গডউইনের ছিল সহযোগিতায় আতঙ্ক। তাঁর আশঙ্কা ছিল জীবিকার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলে ব্যক্তিকে সমাজ গ্রাস করে ফেলবে।

গডউইনের যুক্তিবাদ ও নির্দেশবাদে একটা মস্ত বড় অসঙ্গতি রয়েছে। বইয়ের সূচনায় তিনি বলেছেন যে মানবমনের মুক্তিসাধন করে তার পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করা সরকারের আয়ত্ত। মানুষের চরিত্র সামাজিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকার সমাজপরিবেশ বদলিয়ে মানুষের চিন্তা ও কর্ম প্রভাবিত করতে পারে। লিখতে লিখতে তাঁর বিশ্বাস বদলাল। বইয়ের শেষ দিকে তিনি বললেন বর্তমান অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখবার জন্য প্রধানত সরকারই দায়ী। সুতরাং সংস্কারের দায় তিনি তুলে দিলেন প্রজ্ঞানশীল দার্শনিকের হাতে। এখন চিন্তা ও কর্ম যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা হলে দার্শনিকই বা এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন? অবস্থার ফেরে পড়ে লোকে নরহত্যা করে, হত্যাকারী তার ছোরার মতই পরাধীন;—এ যদি সত্য হয় তা হলে দার্শনিকও তাঁর তত্ত্ব রচনা করেন পরিবেশের তাগিদে, তিনি তাঁর কলমের মতই অবস্থার দাস,—এও তেমন সত্য। পরিবেশ প্রতিকূল হলে দার্শনিকের মুখ দিয়েই বা সত্য কথা বেরুবে কেমন করে, আর যদিও বা বেরোয় তা হলে সে কথা পরিবেশের শাসন এড়িয়ে মানুষের বুদ্ধির দরজায় ঘা দেবে এমন ভরসা কোথায়?

---

[৫] উইলিয়ম হেজ্‌লিট : দি স্পিরিট অব দি এজ, সম্পাদনা—ডব্লিউ. সি. হেজ্‌লিট, লণ্ডন, ১৯০৬, ৪২ পৃষ্ঠা।

গডউইন কেন্দ্রায়িত জাতীয় রাষ্ট্রের জায়গায় যে স্বাতন্ত্র্যশীল গ্রাম-ও জেলা-পঞ্চায়েতের প্রস্তাব দিয়েছেন তাও তাঁর যুক্তির সঙ্গে খাপ খায় না। বিধানসভায় ভোটের দ্বারা সিদ্ধান্তে আসার বিরুদ্ধে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন সেগুলি ক্ষুদ্রতর সভার ওপরও প্রযোজ্য। গ্রাম পঞ্চায়েতেও সভ্যদের হুজুগের কাছে আত্মসমর্পণ করবার এবং কুসংস্কারে আবেদন করবার সম্ভাবনা থাকবে। আর যদি সভায় বসে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে তর্কবিতর্ক শেষ হবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মত গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় কি? অবশ্য গডউইন হয়তো বলবেন যুক্তির নির্দেশ যখন এক ও অদ্বিতীয় তখন সুষ্ঠুভাবে আলোচনা হলে এবং সকলে যুক্তির পথে এলে মীমাংসাও হবে এক, সর্বসম্মত।

গডউইনের সংজ্ঞায় মানুষ হবে প্রজ্ঞানের যন্ত্র, তার স্নেহমমতার বাষ্প বুদ্ধির তাপে শুকিয়ে যাবে। সত্য ও ন্যায় যদি নিছক প্রজ্ঞানের ওপর দাঁড়াতে না পারে তা হলে দয়া ভালবাসা কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তির ঠেকা দিয়ে তাকে দাঁড় করাতে তিনি রাজী নন। তাঁর কল্পনার মানুষকে তিনি বহু উচ্চে প্রজ্ঞানের যে সূক্ষ্মলোকে তুলে ধরেছেন তার নাগাল বাস্তব মানুষ পায় না। সেই সূক্ষ্মলোকে আকাশচারীর পক্ষসঞ্চালনও একদিন ব্যর্থ হয়ে ওঠে, তখন সে ভূমিসাৎ হয়। আশাহত আদর্শবাদী সেদিন আদর্শের প্রহসনে পর্যবসিত হয়। সে ঋণ করে শোধ করে না, প্রেম করে বিবাহ করে না, আর তার আকাশে ফুল ফোটানর প্রয়াস দেখে লোকে টিটকারি দেয়। গডউইনের দশা প্রায় এইরূপই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গডউইনের সমালোচনায় হেজ্‌লিট বোধ হয় তাঁর কথা স্মরণ করেই লিখেছিলেন : "কাগজ-কলমের বীরপুরুষ বাস্তবে ভ্যাগাবণ্ডে পরিণত হতে পারে।"

গডউইন তাঁর কোন কোন ভুল ধরতে পেরেছিলেন এবং পলিটিক্যাল জাসটিস-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ও অন্যান্য গ্রন্থে ভুল সংশোধন করেছিলেন। বুদ্ধির পাশে হৃদয়বৃত্তিকে তিনি জায়গা দিয়েছিলেন; স্বীকার করেছিলেন যে কর্মের উৎস হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধির কাজ কেবল বিভিন্ন কাম্য বস্তুর যাচাই করা এবং তাদের লাভ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় খুঁজে বার করা। আগে তিনি বলেছিলেন সার্বিক কল্যাণ কামনার কাছে পারিবারিক স্নেহভালবাসা উৎসর্গ করতে হবে। এখন বুঝলেন যে এক নৈর্ব্যক্তিক আদর্শকে ধরে কেহ হাসি ও প্রীতি বিতরণ করতে পারে না। কাছে থাকার দরুন যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তাদের প্রতি হৃদয়-বৃত্তির পক্ষপাতিত্ব খুব স্বাভাবিক।

আর বিবাহ সম্বন্ধে তিনি কি রকম কেচে গণ্ডূষ করেছিলেন তাঁর প্রেমপত্রগুলি তার নজির। ১৭৯৮ সালে প্রথম পত্নীবিয়োগের পরে তিনি এক কন্যাকে কামনা করে লিখছেন :

> কৌমার্য মনকে সংকীর্ণ ও পঙ্গু করে এবং জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়গুলি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে।...দাম্পত্য প্রেম, সন্তান বাৎসল্য—ইহারাই পারে হৃদয়ের তালা খুলিতে, অন্তরকে মেলিয়া ধরিতে, ইহারা প্রমিথিউসের আগুন যার ছোঁয়া না লাগিলে আমরা স্বকীয় সম্ভাবনায় ফুটিয়া উঠিতে পারি না।[৭]

দার্শনিকের হৃদয়ের তুষার কখন প্রমিথিয়ুসের আগুনে গলতে শুরু করেছে কে তার খবর রাখে? কার গরজ পড়েছে এই ছাইপাসগুলো এবং পলিটিক্যাল জাসটিস-এর পরিশুদ্ধ সংস্করণ পাঠ করে দার্শনিকের প্রতি একটু সদয় হবে? কারণ তাঁর যশের সূর্য তখন পশ্চিমের যাত্রী। সুতরাং গডউইন তাঁর মত বদলালেও দুর্মুখেরা তাদের মত বদলাল না।

---

[৬] দি স্পিরিট অব দি এজ, ৩০ পৃষ্ঠা।
[৭] ফোর্ড কে. ব্রাউন : লাইফ অব উইলিয়ম গডউইন, ১৪০ পৃষ্ঠা।

গডউইন তাঁর যশের চেয়ে বেশীদিন বাঁচলেন এইটেই তাঁর বড় দুর্ভাগ্য। কিন্তু নিন্দা ও লাঞ্ছনা তাঁর যশ নষ্ট করলেও তাঁর কীর্তি মুছে ফেলতে পারে নি। শিক্ষাব্যবস্থা, বিবাহ, অপরাধ ও দণ্ডবিধির ওপর তাঁর সুচিন্তিত বিশ্লেষণ ভাবীকালের সমাজ-সংস্কারকদের পাথেয় হয়ে রইল। সম্পত্তি, ধর্মসংস্থা, রাষ্ট্রশাসন ও প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের যে যুক্তি-সঙ্গত সমালোচনা তিনি করেছিলেন, উনিশ শতকের নিরাজ সমাজবাদীরা সকলেই তার পুনরাবৃত্তি করলেন। শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কবে কোন দার্শনিক ন্যায়ের আদর্শের চেয়ে বড় যুক্তি দিতে পেরেছে? প্রতিপক্ষের আক্রমণের জবাবে তিনি লিখেছিলেন :

> মানুষের অন্তর যাহা কল্পনা করিতে পারে, মানুষের হাত তাহা সার্থক করিয়া তুলিবার মত শক্তি রাখে।...আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পৃথিবীর উপর অধিকতর সততা এবং উদারতর ন্যায়ের দিন নামিয়া আসিবে।[৮]

যাঁরা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন, সকল যুক্তি ও তথ্যবিন্যাসের উপসংহারে তাঁরা এই প্রত্যয়কেই ঘোষণা করেছেন।

গডউইনের তত্ত্ব দুটি অতিশয়তার দোষে দুষ্ট—এক ব্যক্তিসর্বস্বতা, আর এক প্রজ্ঞান-পরায়ণতা। তাঁর নিজের যুক্তি তাঁর দর্শনের ওপর প্রয়োগ করলে বলতে হয় এ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না,—তাঁর দর্শন ছিল দেশকাল দ্বারা প্রভাবিত। সে যুগে ইংল্যাণ্ডের সমাজে বণিক ও অভিজাতদের প্রভুত্ব খর্ব করে পুরোভাগে আসছিল ধনিক ও শিল্পপতিরা। এই সমাজবিবর্তনের ছাপ পড়ল গডউইনের জীবনে ও রচনায়। উগ্রমত পাতি বুর্জোয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি রূপ দিলেন। শিল্পবিপ্লব এক প্রচণ্ড আঘাত হানল অল্প মূলধনের চাষী কারিগর ও ব্যবসায়ীদের ওপর। প্রকাণ্ড যন্ত্রশিল্প ও একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যে সরকার এগিয়ে এল না। ছোট ছোট কাজকারবারগুলো অসহায় হয়ে পড়ল। ধনিকরা শাসন সংস্কার করে পার্লামেণ্ট দখল করবার জন্যে আন্দোলন করতে লাগল। আর মধ্যবিত্তরা হল চরমপন্থী। টমাস পেন ও গডউইন এই দলের। সংস্কারবাদ ও নৈরাজ্যবাদ উভয়ের নৈতিক মূল এক জায়গায়—সে হল ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ ও সর্বময় মুক্তি বিধানের আদর্শ। সংস্কারবাদীদের গুরু লক্ বলেছিলেন সম্পত্তিতে আছে মালিকের প্রাকৃতিক অধিকার,—শিষ্যরা এই প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা করবার জন্যে রাষ্ট্রশক্তিকে একেবারে বাতিল করল না। রাষ্ট্রের কাজ হল ধনিকের জীবন ও বিত্তের নিরাপত্তা বিধান। স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীনের পক্ষ থেকে নৈরাজ্যবাদী সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করল। সে চাইল স্বাধীন আত্মসর্বস্ব চাষী-কারিগরদের এক সাম্যব্যবস্থা, যেখানে সকলের সুখ, স্বাধীনতা ও জীবিকা সুরক্ষিত এবং কোন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে সরকার ও আইনের প্রয়োজন নেই।

সুতরাং নৈরাজ্যবাদী ধনিকের যন্ত্রশিল্প থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল অতীতের সরল ব্যক্তিকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে। সে চোখ মেলে দেখল না বিপুল-উৎপাদনী কারখানার ভিতরে যৌথ উদ্যোগ গড়ে উঠছে যা অবলম্বন করে জাগছে সর্বহারার শ্রেণী-চেতনা আর সমাজবাদী চিন্তাভাবনা। কাজেই গডউইনের ব্যক্তিসর্বস্ব নৈরাজ্যবাদ কেবল যে ধনিকদের হাতে লাঞ্ছিত হল তা নয়, মজুর শ্রেণী এবং সমাজবাদীদের কাছেও এর আদর হল না।

---

[৮] ফোর্ড কে ব্রাউন : লাইফ অব উইলিয়ম গডউইন, ১৭২ পৃষ্ঠা।

কিন্তু যে তথ্য ও যুক্তির সম্ভার তিনি পরিবেশন করলেন উনিশ শতকের মুক্তিসন্ধানী মনীষাঁর তা উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না। গডউইনের অবদান দুইজন লোকের মাধ্যমে যুগমানসে সমর্পিত হল। একজন কবি শেলী আর একজন সমাজবাদী রবার্ট ওয়েন। শেলীর কাব্যপ্রতিভার উৎস খুলে দিয়েছিল গডউইনের দর্শন। প্রমিথিউস আনবাউণ্ডে তাঁর নিরাজ চিত্র রূপেরসে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। শেলীর কুইন ম্যাবকে বলা হয় পদ্যে 'পলিটিক্যাল জাসটিস'। গডউইনের দর্শনে হৃদয়বৃত্তির যে অভাব ছিল তা পূরণ করলেন শেলী। তাঁর ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে সহযোগিতার ধর্ম জুড়ে দিয়ে আর একটি ফাঁক পূরণ করলেন ওয়েন। গডউইনের নৈরাজ্যবাদ আর ওয়েনের সমাজবাদ গিয়ে পড়ল ফরাসী দার্শনিক প্রুধোঁর হাতে। উভয়ের সমন্বয় হল। তখন থেকে সমাজবাদী ভাবনা দুই ধারায় প্রবাহিত হল,—একটি মুক্তিপন্থী, যার ভাবুক প্রুধোঁ, বাকুনিন ও ক্রপটকিন, আর একটি শাসনপন্থী যার উদ্গাতা মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌ ও লেনিন।

ছাদ

বিমল কর

মিছিমিছি আর কেন কাঠি জ্বালা! ক'বারই তো জ্বালাতে চাইলে! ছাদে এখন বিশ্রী উলটোপালটা হাওয়া। দেশলাইয়ের পুরো বাক্সটাই পুড়বে, তুমি যা খুঁজছ, খুঁজে পাবে না।

শোনো অরুণ, এই ছাদ খুব ছোট নয়। এখানে জঞ্জালও কিছু কম জমেনি। ত্রিশ বত্রিশ বছরের আবর্জনা শুধু তোমরাই জমিয়েছ, তার আগে আরো কত বছরের জঞ্জাল আমরা জমিয়েছি—তার হিসেব নেই। সব মিলেমিশে এই ছাদ এখন আমাদের তিন চার পুরুষের।

উত্তর দিকের আলসে ধরে, ওই যে টিনের কুঠরি ঘর, যার না-দরজা না-জানলা, শুধু গা-গলানোর মতন একটা ফোকর—ওই ঘরে না আছে কি! আমার বাবা যে-পালংকে শুয়ে চোখ বুজেছিলেন, সেই পালংকের খান দুই ভারী পায়া আজও পড়ে আছে। আমার মা-র পাখি-তোলা হাতবাক্সর ডালা, ছেঁড়া খোঁড়া ঝাঁপি, তোমার পিসির বিয়ের পোকাধরা পিঁড়ি, আমার ছেলেবেলার দুটো কাঠের মুগুর, তোমার মার গঙ্গাজলের গলা ভাঙা তোবড়ানো ফুটো পেতলের ঘড়া, তোমাদের বাচ্চা বয়সের ট্রাইসাইকেলের ভাঙা হাতল, চাকা, কচ্ছপ-পিঠ ক্যারাম বোর্ড, বিনুর সেই চীনে-ভূত কাঠের পুতুল, ময়নার খাঁচা...সবই আছে ও-ঘরে। আর আছে দাদুর উইয়ে ধরা মস্ত বড় রঙিন ছবি; কতক তেলাপোকা খাওয়া ফটো, রাজ্যের ভাঙা কাঠ, কলংক ধরা কালো ভাঙা বাসন; জলের ড্রাম, দড়ি, শন, নারকোলের ছোবড়া ওঠা গদী, দু-চারখানা তোশক—যা দেখলে মনে হয় শ্মশান থেকে বুঝি কুড়িয়ে এনে রেখেছে।

অরুণ, এই জাদুঘরের মধ্যেও দুটি জিনিস এখনো বেশ টিকে আছে। ছেলেবেলায় যে-দোলনায় বিনু দোল খেতে খেতে মুখে আঙুল পুরে ঘুমিয়ে পড়ত সেই দোলনাটা এখনো প্রায় অটুট। তোমার সেই কাঠের দোলনা-ঘোড়াটাও। রঙ চঙ কবে মুছে গেছে, ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে চলকা উঠেছে, কান ভেঙেছে—তবু ওটা আছে।

আজ, এই ভরা রাতে, উলটো-পালটা হাওয়ায় একটা ষাট কাঠির দেশলাই পকেটে নিয়ে তুমি কি ওই দোলনা বা ঘোড়াটার খোঁজ করতে এসেছ!...তা নয়, অরুণ। এ-দুটোর কোনোটাতেই তোমার প্রয়োজন নেই, বিনুরও নয়, আমি জানি।

আমি জানি অরুণ, কিসের খোঁজে তুমি অন্যমনস্ক, ক্লান্ত, শিথিল পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অন্ধকারে একলা এখানে এসে দাঁড়িয়েছ।

যে-জাদুঘরের কথা আমি বললাম—সে-ঘরের গুমোট, মাথা ঝিমঝিম, উগ্র, কেমন এক ভ্যাপসা—কটু গন্ধ তোমার অসহ্য, তুমি ওখানে যাবে না।...তবে এই বাকি ছাদটুকুতে কি আছে, কিসের জন্যে তুমি এসেছ, কেন দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালছ?

এই ছাদ খোলা মেলা, অনেকটা জায়গা। একটা তক্তপোশ পড়ে আছে এক পাশে, ক্যাম্বিসের হেলানো আরাম-চেয়ারও একটা, কয়েকটা ফুলের খালি টব। দু তিনটি অ্যানামেলের ভাঙা গামলায় মাটি ভরে বেলফুল ফুটিয়েছিল সুষমা; শুকনো কটি শাখা দু-চারটি পাতা নিয়ে তারা এক পাশে পড়ে আছে। গোটা দুই ভাঙা টিন, চুনকাম করার

সময় ভারা বাঁধার এক গণ্ডা বাঁশ, আর...আর কতকালের একটা ডালিম গাছ এক কোণে। ইট গেঁথে চৌবাচ্চার মতন করে কে যে মাটি ঢেলেছিল, ডালিম গাছটা পুঁতেছিল আজ আর আমার মনে নেই।

তুমি কি এই তক্তপোশ, ফুলের টব বা ডালিম গাছটার তলায় কিছু খুঁজতে এসেছ? অথবা এই গোটা ছাদের ধুলোয় ময়লায় অন্ধকারে আলসের ফাঁকে ফাঁকে কিছু দেখতে এসেছ?

ওই তক্তপোশটায় তুমি দু দণ্ড গা এলিয়ে শুয়ে পড়, অরুণ; না হয় ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় আরাম করে বসে থাক একটু। আজ তোমার সারাটা দিন বড় ধকল গেছে। কাল মাঝ রাত থেকেই। ডাক্তারের বাড়ি ছুটোছুটিই তো কবার করলে—তারপর আবার মাঠকুড়িয়ার শ্মশান যাওয়া। সে কি আর কাছে—প্রায় মাইল পাঁচেকের পথ। শ্মশান থেকে ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। চৈত্রের এই ঝাঁঝাল রোদে অনেক পুড়েছ; চিতার আগুন নদীর জল তোমার শরীর থেকে অনেকখানি নিয়েছে। তুমি যে কত শ্রান্ত ক্লান্ত উদাস অন্যমনস্ক বিহ্বল এবং বিমূঢ়—আমি জানি অরুণ।

কাল মাঝরাতে যখন সুষমার ওই রকম অবস্থা, সারা বাড়িতে হুটোপাটি, ছুটোছুটি তখন সকলেই ভেবেছিল তুমি বিছানা ছেড়ে উঠবে না, ডাক্তার বাড়ি ছুটবে না। ওরা বলাইকেই পাঠাতে যাচ্ছিল। আমি বারণ করলাম।...ঠিকই করেছিলাম। দেখলাম তো ওদের ছুটোছুটি চেঁচামেচিতে তুমি জেগে উঠেই সুষমার ঘরে এসে দাঁড়ালে।...কাউকে কিছু বলতে হল না, সাইকেলটা নামিয়ে নিয়ে নিজেই তুমি ডাক্তারবাড়ি ছুটলে। আমি জানতাম, তুমি নিজেই ঘুম থেকে জেগে উঠবে, তুমি নিজেই ডাক্তারবাড়ি যাবে। কারণ সুষমা তোমার স্ত্রী।

শ্মশানে যাবার সময়ও বাড়ির লোকে ভেবেছিল, তুমি কিন্তু কিন্তু করবে, এড়িয়ে যেতে চাইবে। তুমি, অরুণ, তোমার কর্তব্য ও দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করনি। সুষমা মারা যাবার পর শান্তভাবেই থানায় গেছ। দারোগাকে নিয়ে এসেছ। পুলিসের লোক যা দেখতে চেয়েছে যা করতে চেয়েছে—কোথাও বিন্দুমাত্র বাধা দাওনি, অধৈর্য হওনি।

আমি নিজেই অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। বিষ খেয়ে মরেছে সুষমা, তাড়াতাড়িই মরেছে, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি মৃত্যু-যন্ত্রণাকে সে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছে—তত তাড়াতাড়ি তার দেহটা পালাতে পারবে না। চেতনা কত সহজে, কত দ্রুত এক পার থেকে আরেক পারে চলে যেতে পারে, দেহ পারে না।

সুষমার ঠাণ্ডা, ঈষৎ অনম্য, নির্ঘাম, অ-শ্বসন দেহটা আরো কঠিন কাঠ নিছক বস্তু-ভারের মতন হাড়-মাংসের তাল হয়ে এক কি দুদিন পর তোমাদের কাঁধে চাপুক—এ আমি কিছুতেই কল্পনা করতে পারছিলাম না। মানুষ, অন্তত আমার পুত্রবধূ, দর্জির দোকানে ফেলে দিয়ে আসা কাপড় নয় যে তাকে মাপে মাপে ছাঁটকাট করতে হবে। সুষমা সুষমার মতন থাকতে থাকতেই তার দেহটাকে তোমরা এই ভূমণ্ডল জোড়া বাতাসে মিশিয়ে দাও।

অধৈর্য হয়েছিলাম বলেই আমায় একবার মুখুজ্যে মশাইয়ের গাড়ি করে সরকারী হাসপাতালের সার্জন সাহেবের কাছে এবং পরে নতুন হাকিমের কাছে যেতে হল। বেলা দশটা নাগাদ পুলিসের ছাড়পত্র নিয়ে ফিরলাম।

তুমি এ-সব করতে না অরুণ। আইনের কাছে করযোড় হতে না, সামান্য সুবিধেও চাইতে না। সুষমাকে যদি ওরা মাছ কোটার মতন করেও কুটত, যদি তার বিকৃত অবয়বের

স্থূল রেখাগুলো জুড়েও আমাদের সুষমাকে তৈরি করা না যেত—তবুও তুমি দ্বিধা করতে না শ্মশান যাত্রার সময়। আজ যেভাবে যেমন করে সংযত ভদ্র শান্ত স্থিতধী মানুষ হয়ে আর পাঁচজন যাত্রীর সঙ্গে শ্মশান যাত্রায় পা বাড়ালে—অবিকল তেমন করেই পা বাড়াতে যদি মর্গ ফেরত সুষমার লাস আগামী কাল বিকেলেও আসত পচা গন্ধে বাতাস বিষাক্ত করে।

আমি প্রথমে দোতলার কোণা-বারান্দা দিয়ে, পরে সদরের কাছে হরিতকী তলায় দাঁড়িয়ে তোমার যাওয়া দেখছিলুম। জামাটা তোমার চটকানো ময়লা ময়লা, ধুতি কখন মালকোঁচা মেরে নিয়েছ, মাথার চুল উসকো খুসকো, ঘামে সমস্ত মুখ আঠা আঠা, চশমাটা প্রায় নাকের ডগায় নেমেছে। অত তাত, পা রাখা যায় না—তবু সদরের বাইরে এসে কি ভেবে বলাই সন্তুদের দেখে পায়ের চটিটা খুলে ফেলে দিলে। (আমি ভাবছিলাম, খালি পায়ে দুপুর রোদে তুমি কি করে পথ হাঁটবে!)...সদরের বাইরে ওরা সুষমার খাট কাঁধে তুলল, তুমি পিছনে এক পাশে দাঁড়িয়ে। অন্তঃপুর থেকে ঝিমনো কান্নাটা তখন সদরে এসে শেষবারের মতন জোর হয়ে উঠেছে। ছোট বড় গলায় হরিধ্বনি উঠল। তুমি আকাশের দিকে তাকালে, মাথার চুলে একবার আঙুলের চিরুনি টানলে।...শবযাত্রা এগিয়ে চলল, চৈত্রের খর রোদ, ধুলো-ওড়া দমকা বাতাসে ক্লান্ত করুণ কান্নার রেশ বুঝি মাখামাখি হয়ে এখানে কিসের এক দুর্বোধ্য শোক ছড়িয়ে দিল। তুমি বিচলিত হলে না, হরিধ্বনি দিলে না, পিছু ফিরে তবু একবার তাকালে। বাঘা কুকুরটা আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে ঘেউ ঘেউ করছিল। দেখলাম সে তোমার পাশে পাশে যাচ্ছে।

শ্মশানে আমি যাইনি। না গিয়েও জানি তুমি একবারও অস্থির হওনি। চিতা সাজানো হয়েছে, চিতা জ্বলেছে, সুষমার দেহটা শেষ বিকেলের রোদে নদীপারের ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তুমি সারাক্ষণ কোনো ছায়ার তলায় বসে অথবা চিত হয়ে শুয়ে ভেবেছ, সুষমা কেন বিষ খেল? কেন?

শোনো অরুণ, প্রতিদিন নকল অমৃত খাওয়ার চেয়ে একদিন বিষ খাওয়া ভাল।... সুষমা গত চার বছর ধরে প্রত্যহ এই নকল অমৃত খাচ্ছিল, কাল রাতে সে বিষ খেয়েছে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তুমি যদি তারা গুনতে চাও গোনো। কিন্তু ভেব না, সুষমা ওই শূন্য থেকে আজ তোমার দুটি ছোট্ট প্রশ্নের জবাব দেবে।

আমি তোমায় একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।...তুমি মনে মনে ভেবে দেখ, সত্য বলেছি কি না!

চার বছর ধরে তোমরা—তুমি আর সুষমা—স্বামী-স্ত্রীতে রেষারেষি করলে। এমন রেষারেষি আর আমি দেখিনি। অথচ এই রেষারেষি কেন, কিসের?

অরুণ, আমি আজও বুঝতে পারলাম না বিয়ের পর সেই যে কদিন মাত্র তোমরা এক সাথে ছিলে—তারপর এমন কী হল যার জের টেনে চলেছিলে এতকাল, পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত থেকে!

আমার মনস্তাপ দুঃখ তোমায় বোঝানো যাবে না, কেউ নেই এ-সংসারে যাকে কাছে ডেকে বলি। তোমার মা বেঁচে থাকলে—তাকে বলতাম; সে শুনত বুঝত অনুভব করতে পারত!...বলতে পার অরুণ, কোন অন্যায় আমি করেছিলুম তোমার বিয়ে দিয়ে? সুষমাকে আমি পছন্দ করেছিলুম এতে কি সর্বনাশটা বাস্তবিকই তোমার হয়েছে?...ডানা কাটা পরী নিশ্চয় ছিল না সুষমা, কিন্তু সে অরূপা ছিল না। আমাদের মতন সাধারণ বাঙালী

ঘরে কে উর্বশী খুঁজে বেড়ায়, অরুণ। সুষমা যদি কুরূপা হত, যদি তার আচার আচরণ জ্ঞান বুদ্ধি স্বভাব মন্দ হত, আমি বুঝতে পারতাম তোমার সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণ ঘটেছে। আমি না, এ-বাড়ির কেউ না, এমন কি তুমি পর্যন্ত সুষমার রূপের শান্ত সৌন্দর্য লাবণ্য, তার স্বভাবের শুদ্ধতা ও নমনীয়তা, তার বুদ্ধি বিবেচনার ঐশ্বর্যের বিপক্ষে কিছু বলতে পারবে না। কোনোদিন কেউ বলেনি তো!...কাজে কাজেই তোমাদের স্বামী স্ত্রীর বিরোধ স্বাভাবিক পাঁচটা কারণে বাধেনি।

তবে...? তবে যে কোন কারণে আমি জানি না।

অনেকদিন আগে—বছর খানেকেরও বেশি হল—আমি সুষমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম,—তোমার এত পরিশ্রমের কি আছে, বউমা?

বাস্তবিকই কি ছিল সকাল থেকে ঘানি ঘুরোনো শুরু করে মাঝ রাত পর্যন্ত সমানে টেনে যাওয়া। ভোর থাকতে থাকতে সেই যে উঠত মেয়েটা, বেলা দশটা পর্যন্ত সংসারের দায় সামলাত—চা জলখাবার রান্না ভাঁড়ার, তাঁতের মাকুর মতনই দণ্ডে দণ্ডে ওর জায়গা বদল হচ্ছে, এই যদি নীচের উঠোনে মাছ ধুয়ে কাক তাড়িয়ে উঠল, পর মুহূর্তেই দেখ দোতলার বারান্দায় কাচা কাপড় মেলে দিচ্ছে—আর ঠিক পাঁচ মিনিট পরে খোঁজ করলে দেখবে, পুতুলের ইংরিজি পড়াটা বলে দিচ্ছে, বা শেফালির স্কুলে যাওয়ার শাড়ির ছেঁড়াটুকু সেলাই করতে বসেছে।...ওরই মধ্যে এক ফাঁকে দু ঘটি জল ঢেলে স্নান করে নিল—ভিজে চুল এলিয়ে আরো পাঁচটা কাজ সারল। দশটা বাজল কি পুতুল শেফালিকে সঙ্গে করে সুষমাও বেরুল। সাধারণ একটা শাড়ি পরনে, ভিজে চুল কোনো রকমে ঘাড়ের কাছে ন্যাতার মতন জমানো, গাটাপার্চারের কাঁটা বেরিয়ে রয়েছে। মাথায় মেয়ে-ছাতা, পায়ে চটি—দুপাশে দুই ভাগ্নি নিয়ে ও চলল স্কুলে।...স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে সুষমার কোনো কোনোদিন পাঁচটাও বেজে যায়। নয়তো সাড়ে চারটের মধ্যেই সে ফেরে। ফিরে বুঝি একটু বিশ্রাম, তারপর আবার সংসার। উনুনে ধোঁয়া উঠিয়ে, লণ্ঠনে শিস জ্বালিয়ে সেই যে রাতের সংসার শুরু হল—সে-সংসার শান্ত নীরব হতে হতে দশটা এগারোটা। এগারোটা রাত—বাড়ির আর সবাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঠ—শুধু সুষমার ঘরে তখনও জানলা খোলা—লণ্ঠন জ্বলছে। আর জ্বলছে তোমার ঘরে, অরুণ। তোমাদের দু'জনের ঘর পাশাপাশি হলেও বারান্দার ঠিক জোড়ের মুখটায়, কোণাকুণি—এক ঘর থেকে আরেক ঘরের দরজা জানলা দেখা যায়।...সুষমার ঘরের বাতি নিভতে কোনোদিন রাত দুটো বেজে যেত।

—তোমার এত পরিশ্রমের কি দরকার, বউমা? আমি একদিন ওকে শুধিয়েছিলাম।

জবাব দিতে অনেকটা সময় লেগেছিল ওর; তাও স্পষ্ট জবাব নয়, কোনোগতিকে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া। 'স্কুলে পরীক্ষা হয়ে গেছে, ছুটি হয়ে যাবে শীঘ্রি, খাতাগুলো দেখতে হচ্ছে।'

—সারা বছর ধরে তোমাদের স্কুলে পরীক্ষা হয় নাকি?

সুষমা নিরুত্তর।

—তোমার ঘরে রোজই একটা দুটো পর্যন্ত বাতি জ্বলে বউমা। অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকার—

—সারাদিনে সময় পাই না, বাবা...রাত্তিরে একটু পড়ি—। সুষমা আমায় কথা শেষ করতে না দিয়ে (হয়ত শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন কোন পথ ধরে সেই ভয়ে) দ্রুত গলায় বলেছিল, ওর কণ্ঠস্বর মৃদু, অস্বস্তিভরা।

খবরটা আমার কাছে নতুন নয়। আমি জানতাম। এ-ধরনের দায়-এড়ানো সহজ জবাবের

জন্যে প্রশ্নটা তুলি নি। আমি আরো গভীর, সত্য জবাব জানতে চাইছিলাম। বুঝতে পারলাম, সুষমা সে-জবাব দেবে না।

—স্কুলের চাকরি, রাত জেগে জেগে বই মুখস্ত...মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না এ-সবের কি দরকার ছিল, বউমা।

সুষমাকে আর কখনও আমি ঠিক এ-ভাবে কিছু শুধোয় নি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম সত্য কথাটা সে কোনোদিনই আমায় বলবে না। শুধু যে সংকোচ তা নয়, বুড়ো শ্বশুরকে সে আঘাত দিতেও চায় না।

আমার মনে হয় অরুণ, তোমার মা বেঁচে থাকলে সুষমা তার মনের খানিকটা অন্তত জানাতে পারত। আমায় সে কোন মুখে বিবাহিত জীবনের সব চেয়ে বড় বেদনার কথা বলবে। কেন যে তাতে আর তোমাতে এই সমান্তরাল রেখার মত ব্যবধান ও সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটে যাওয়া আমায় তা বুঝিয়ে দেবে।

একদিন তোমার কাছেও কথাটা তুলেছিলাম। মনে পড়ে তোমার?

—বউমার শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, অরুণ।

—অসুখ—? তুমি নির্বোধের মতন তাকালে। কথা বললে ঠাণ্ডা গলায়।

—এখনও কিছু হয় নি, তবে যে-ভাবে শরীর ভাঙছে হতে আর কতক্ষণ—। আমি অপ্রসন্ন গলায় জবাব দিয়েছি। তোমার ওপর আমি ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলাম তখন। মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল। ছেলেমানুষের মতন কথা বলার বয়স নিশ্চয় তোমার নেই।

—ডাক্তারবাবুকে একদিন দেখিয়ে এলেই হয়—। তুমি বললে।

—দেখিয়ে এলে—

—ডেকে পাঠালেও হয়।

—সুষমা নিজে গিয়েই খবর দিয়ে আসবে তবে।

—...না, মানে—বলাই টলাই কেউ—; আচ্ছা আমিই বলে আসব।

আমার অসহ্য বিরক্তি বীতরাগ তুমি যতই বুঝতে পারছিলে ততই পারিবারিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলে। কিন্তু ও-সব ফুকো কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে আমি তোমায় ডাকি নি। আগাগোড়াই আমি চাইছিলাম, চেষ্টা করছিলাম গভীরতর এক ইঙ্গিত দিতে।...সম্ভবত, আমি যা বলতে চাই তুমি পরে বুঝতে পেরেছিলে। কিন্তু সুষমার মতনই জেনেশুনে পাশ কাটাবার চেষ্টা করতে লাগলে। অন্ধ হবার ভাণ করে তুমি যদি কিছুই না জানা না দেখার ভাব দেখাও, আমি আর কত তোমায় দেখাব!

—স্কুলে চাকরি করবার, কি দরকার বউমার?

—কি আর—সাহায্য।

—আমার পেনসনের টাকা আছে, তোমার মাইনে আছে— তাতে সংসার চলে না?

—কি জানি, সংসারটা তো বড়ই; হয়তো আরও টাকার দরকার হয়।

—আমায় তো তোমরা কোনোদিন সে-কথা জানাও নি।

তুমি বিব্রত বোধ করছিলে। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এ-সব প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ক্রমশই তুমি ফাঁদে পা ফেলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছ ভেবে উৎকণ্ঠায় চঞ্চল।

—সন্ধ্যের দিকে একটা টিউশানি করছে বউমা আজকাল—

—হ্যাঁ, ওই বিকেলের দিকে, স্কুল-ফেরত—

—পোস্ট অফিসে এখনো আমার কিছু টাকা আছে, অরুণ।...টাকাটা তোমরা নাও।...

আমি মরে যাই, তারপর—তারপর তোমাদের যা খুশি করো; চাকরি, টিউশানি, ঠোঙা বিক্রি—

আমি সেদিন কত বেদনায় কী কষ্টে চুপ করে গিয়েছিলাম অরুণ, তুমি হয়ত বোঝোনি। ভেবেছিলে, আমার মর্যাদায় ঘা খেয়ে আমি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছি। মর্যাদার প্রশ্ন নিশ্চয় ছিল, এ-সংসারের সম্মানও যে জড়িত ছিল না তাও নয়, বুড়ো বয়সের সংস্কারও খানিকটা, কিন্তু তাই কি স-ব—সমস্ত! ওই বেচারী মেয়েটার আত্মক্ষয় কি আমায় যন্ত্রণা দিত না!

খানিক চুপচাপ থাকার পর তুমি উঠে দাঁড়ালে। তোমার বলার কিছু ছিল না। যাবার সময় আমায় যেন সান্ত্বনা দিচ্ছ এমনভাবে বললে, মৃদু ভাঙা ভাঙা অনিশ্চিত গলায়,—'সব সময় অভাবের জন্যেই মানুষ কাজ করে না—; ভালো লাগে ইচ্ছে করে...আনন্দ পায় কাজ ক'রে।'

শোনো অরুণ, কাজ করে আনন্দ পাওয়ার কথাটা হয়ত অন্য কোথাও সাজে, এখানে সাজে না। সুষমা আনন্দ পেত না। যদি এই সংসার তার নিজের মনের সঙ্গে মিশত, তার মজ্জার হত আনন্দ সে পেত। যেমন তোমার মা ঠাকুমা পেয়েছে। তারা তাদের স্বামীকে পেয়েছিল, স্বামীকে সেতু করেই সংসার পেয়েছিল, সন্তান পেয়েছিল। সুষমা কি পেয়েছে? স্বামী তার কাছে একই বাড়ির ভাড়াটের মতন, এই সংসার তার কাছে নিছক দায়, সন্তান আকাশকুসুম।

আমায় তুমি অন্তত সংসারের সুখ আনন্দ তৃপ্তির পথ চেনাতে এস না। তোমার জন্মের বহু আগে আমি এসেছি, তোমার অনেক আগেই আমি যাব। যখন এসেছিলাম তখন মানুষ তোমাদের মতন হয় নি, যখন যাব তখন তোমাদের মতনই হয়ে গেছে সব।

যদি তোমার বোধ বুদ্ধি এতটুকুও থাকে, তবে বলব, সুষমা সুখ আনন্দ তৃপ্তির আশায় কাজের সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় নি। একটা বোঝার পর আর-একটা বোঝা সে মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে তোমার সঙ্গে রেষারেষি করে মরতে। কে কতটা পারে, কে কতখানি সইতে ক্ষমতা রাখে, কার দক্ষতা কত বেশি—তোমাদের স্বামী স্ত্রীর এই প্রতিযোগিতা আমি চার বছর ধরে দেখেছি।

আমার মনে পড়ছে, অঘ্রাণ মাসের এক পড়ন্ত বিকেলে বিয়ের কনে সুষমার এ-বাড়ির চৌকাটে এসে দাঁড়াবার ছবিটি। লাল বেনারসী পরা ফরসা ছিপছিপে একটি মেয়ে; কপালে চুলের ধার ছুঁয়ে ছুঁয়ে লাজুক একটু ঘোমটা, শোলার মুকুটটা সামান্য হেলে গেছে, বাঁ-হাতের মুঠোয় কাজললতা, গাঁটছড়া ঝুলে ঝুলে পড়ছে। শাঁখ বাজল, উলুতে আকাশ ভরল। ভীরু, ধীর, লক্ষ্মী পায়ে পায়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল এ-বাড়ির আরেক বউ। ছবিটি আমি ভুলব না, অরুণ। তোমার মা-র কথা বারবার মনে পড়ছিল আমার। সে নেই। থাকলে আজকের দিনে আমার মতনই ওই শান্ত মমতাভরা মুখটির দিকে চেয়ে, দুটি কালো নিরীহ অসহায় চোখের দিকে তাকিয়ে মায়ায় গলে পড়ত। তোমার মা খুশী হত, আমায় তারিফ করত; বলত : চমৎকার বউটি এনেছ বাপু তুমি, লক্ষ্মীশ্রী আছে।...তোমার মাকে সেদিন পাশে না পেয়ে বুক আমার খাঁ খাঁ করছিল, আবার সেই সঙ্গে অসহ্য আনন্দ হচ্ছিল এই ভেবে, তোমার মাকে আমি খুশী করতে পারতাম আজ। আমার এই দুঃখ এবং সুখে আত্মহারা হয়ে গিয়ে আমি একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলেছি। জল ভরা চোখে দেখেছি, আমার ছেলে, ছেলের বউ...উঠোন ভরে পরিজন...হাসি ভরা মুখ...কলস্বর...দুধ পোড়া গন্ধ...।

এই মধুর ছবি কত তাড়াতাড়ি কেমন আশ্চর্যভাবে বদলাতে লাগল। সুষমার উজ্জ্বল মুখ ধীরে ধীরে অনুজ্জ্বল হয়ে এল; তার ভীরুতা ভাঙল, পরিবর্তে দেখলাম কিসের অদ্ভুত দৃঢ়তা; প্রত্যাশায় ও স্বপ্নে যে-মুখ লাজুক নম্র ছিল সেই মুখ প্রাণহীন পাথর হয়ে এল।

তোমরা যে কী মারাত্মক রেষারেষি শুরু করলে অরুণ! দু-ঘরে দুজন, দু-জনেই সমান নীরব, জিভ সেলাই করে বসে আছ। কেউ কাউকে জোর গলায় একটা কথা বলবে না, শত প্রয়োজনেও নিজের থেকে ডাকবে না, তোমাদের অভাব অভিযোগ জানাবে না ভুলেও। তোমাদের স্বামী স্ত্রীর কারও একের প্রতি অন্যের দাবী দাওয়া নেই। এমন ঘটনাও যদি একদিন ঘটত যে, তোমরা দু-জনে কলহ করছ, তবু বা বুঝতাম। কথা কাটাকাটি কলহ স্পষ্ট বিরোধও যে কোনোদিন চোখে পড়ল না। তোমরা প্রয়োজনে মাপ করে কথা বলেছ, ওপর ওপর কর্তব্যটুকু পালন করেছ, সম্পর্কের নিছক দায়টুকু সয়েছ।

শেষ পর্যন্ত দুটি মানুষ পাশাপাশি দুঘরের ভাড়াটে হয়ে গেলে। দুজনেই সমান কঠিন, সমান আত্মকেন্দ্রিক; তোমাদের আত্মমর্যাদা অহংকার ব্যক্তিত্ব দাঁড়িপাল্লায় ঝুলিয়ে ওজন করলে কারও ওজন এক চুল কম হত না।

তবে বলি অরুণ, এক সময় বেদনা ভুলতে, দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখতে সুষমা হাত বাড়িয়ে কিছু কাজের বোঝা টেনে নিয়েছিল। সেই কাজ শেষে নেশা হল কিছুদিন। পরে আর নেশা থাকল না, প্রতিযোগিতার বস্তু হয়ে উঠল।...আমি দেখেছি, মাঝে মাঝে রাত্তিরে—হয়ত তখন বারোটা কি একটা—সুষমা তার জানলায় দাঁড়িয়ে আছে, কোনো কোনো দিন বারান্দায় এসেও একটু দাঁড়াত, তোমার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকত, দেখত তোমার ঘরে তখনও বাতি জ্বলছে। আবার সে নিজের ঘরে ফিরে যেত, সারাদিনের ক্লান্তি ক্ষয় অবসাদে তার শরীর টলছে, মুখ বসে গেছে, ঘুম টানছে—তবু সে বিছানা নেবে না, বাতি নিভিয়ে দেবে না। তোমাকেও আমি দেখেছি অরুণ, সুষমার ঘরের বাতির সঙ্গে রেষারেষি করে বাতি জ্বালিয়ে রাখতে। এক এক সময় আমার মনে হত, কার আলো কতক্ষণ জ্বলে, কে আগে নেভে কে পরে তোমরা তার প্রতিযোগিতা করছ।

সুষমা সেই প্রতিযোগিতায় তোমার কাছে হেরে গেছে। হেরে গেছে বলেই বিষ খেয়েছে। চার বছর ধরে প্রতিটি দিন সে নকল অমৃত খেয়েছিল, সে স্ত্রী না হয়েও স্ত্রীর সাজসজ্জা দায় অদায় নিয়ে কাটিয়েছে; এ-সংসারে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ তার ছিল না, তবু সংসারের আগুনে নিজেকে তিল তিল করে ক্ষয় করেছে; স্কুলের টিচারী, ছাত্রী পড়ানো, রাত জেগে জেগে পড়াশোনা—এ-সব তার আনন্দের কাজ ছিল না, নিজেকে বেঁধে রাখার খুঁটি ছিল—এই খুঁটিতে সে বেঁধেও রেখেছিল নিজেকে।

শেষ পর্যন্ত আর পারল না। পারল না বলেই কাল মাঝরাতে এই ছাদে উঠে এসেছিল। কাল বড় গরম গেছে। রাতে হাওয়া দিতে শুরু করেছিল, তক্তপোশে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। মনে হল, কে যেন এসেছে ছাদে! কে! স্বপ্ন দেখছি হয়ত। ছাদের ওই জাদুঘরে কে যেন গেল, দাঁড়াল, খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর এ-পাশে এল, ডালিমগাছের দুটি পাতা ছিঁড়ল, বেলফুলের গামলাটা পায়ে করে একটু ঠেলল—আলসে ধরে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ, শেষে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে আমার পায়ের দিকে সরে গেল। আমি শুয়ে রয়েছি বলে পায়ে হাত দিতে পারছিল না। তক্তপোশে—আমার ঠিক পায়ের কাছটিতে ও মাথা নুইয়ে হাত বুলিয়ে প্রণাম করছিল। ওর হাত আমার পায়ে ছুঁয়ে গেল আচমকা।...আমি চমকে উঠলাম। এ তো স্বপ্ন নয়। উঠে বসলাম।—কে, বউমা—!

সুষমা ধরা পড়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল।—এত রাতে ছাদে উঠে এসেছ?

—বড় গরম—। দুর্বল জড়ানো ভয় ভয় গলায় সুষমা বলল,—ঘরে হাঁপিয়ে উঠছিলাম,

তাই একটু ছাদে এলাম।

ঘরে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল অরুণ; আমারই মতন তাই সে ছাদে এসে উঠেছিল।

—রাত অনেক হয়েছে; এবার শুয়ে পড়গে যাও।

—যাই।

সুষমা অস্ফুট দুরদুর গলায় বলল।

কখন দেখি সে চলে গেছে।

বোধ হয় ঘণ্টা খানেক পরে নীচে থেকে ডাকাডাকি চিৎকার ছুটোছুটি শুনলাম। নেমে দেখি, সুষমা তখনও বমি করছে। যন্ত্রণায় তার সারা শরীর কুঁকড়ে গেছে, গাল দুটো সাদা, কপালে ঘাম।

অরুণ, যাবার আগে সুষমা মাঝরাতে একবার ছাদে এসেছিল, এই ফাঁকায় হাওয়ায়; একবার সে আমাদের ওই টিন-কোঠার জাদুঘরের ঘ্রাণ নিয়েছিল। কেন নিয়েছিল? অকাজের অপ্রয়োজনের, অতীতের কিছু টুকরো ভাঙাচোরা ধুলো ভরা ভালবাসার স্মৃতি ছাড়া ওখানে তো কিছুই নেই! হয়ত স্মৃতি হলেও ওরা সত্য, কোনো এক ধরনের কাল-নিরপেক্ষ পুঁজি নিয়ে বেঁচে আছে, কিঞ্চিৎ প্রাণ-ঐশ্বর্য নিয়ে।

সুষমা কাল রাতে এসেছিল, সে মারা যাবার পর আজ রাতে তুমি এসেছ, অরুণ। কেন?

দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে এই উলটো-পালটা হাওয়ায় তুমি কি খুঁজছ আমি জানি না। কিন্তু অনুমান করতে পারি। খুব সম্ভব, তুমি সুষমার আলমারির চাবিটা খুঁজতে এসেছ। চাবিটা পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি শুনেছ, কাল রাতে সুষমা ছাদে ছিল। তুমি জান তার আঁচলে চাবি বাঁধা থাকত। হয়ত তুমি ভাবছ, কাল রাতে যখন সে ছাদে এসেছিল কোনো রকমে আলগা আঁচল থেকে চাবিটা গিঁট খুলে পড়ে গেছে।

সুষমা তার নিজের ঘরে তার সাধের আলমারির মধ্যে কি যে শেষ পর্যন্ত রেখে গেছে তা জানবার জন্যে তোমার মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটা ছোট চিঠি, কিংবা তোমার জন্যে একটু-বা অন্য কিছু...

কী ভীষণ নির্বোধ তুমি, অরুণ! সুষমার সাধের আলমারির পাললা খুললেই কি জানতে পারবে সে-বেচারী তোমার জন্যে কি রেখে গেছে? যে-মানুষটা রাতের পর রাত জানলা খুলে আলো জবালিয়ে বসে থাকল—তুমি দু পা এগিয়ে এসে তার দরজাটা পর্যন্ত ঠেলে দেখলে না দরজাটা খোলা না বন্ধ, কী সে রেখেছে ঘর ভরে, কোন আলোর তলায় কী বস্তু—সেখানে সামান্য আলমারির কাঠের ফাঁকে তুমি আর কি পাবে, কতটুকু!

চাবিটা সুষমা ওই জাদুঘরের ভিড়েই হয়ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে, অরুণ। তুমি তা খুঁজে পাবে না। কোনোদিনই নয়। তবে আর কেন বৃথা দেশলাইয়ের কাঠি জবালা!

ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমুদ্রপারের অবস্থাটা একবার দেখে নেওয়া যাক। ইংলণ্ডেও লড়াইটা জমে উঠেছিলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সঙ্গে অন্য ব্যবসায়ীদের ও কলকারখানার মালিকদের।

ভারতবর্ষে ও চীন দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর যে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার ছিলো তার বিরুদ্ধে অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা তুমুল আন্দোলন সুরু করেছিলো ইংলণ্ডে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে *A View of the present State and future Prospects of the Free Trade and Colonization of India* নামে একটি পুস্তিকা লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থকদের কাছে এই পুস্তিকার কদর বাইবেলের চেয়ে কম ছিলো না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে যাতে আবার চার্টর না দেওয়া হয় ভারতবর্ষে এক-চেটিয়া ভাবে ব্যবসা করতে তার জন্যে পার্লামেণ্টেও অনেক সদস্য উঠে পড়ে লাগেন। তাঁরাও এই পুস্তিকা থেকেই তাঁদের যুক্তি যোগাড় করতেন। এই পুস্তিকাটিতে বলা হোলো যে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে—

"A thorough freedom of commercial intercourse between the European and Indian dominions of the Crown, and an unrestricted settlement of Englishmen."

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থাকাতে, এবং অবাধ বাণিজ্যের অধিকার থেকে সাধারণ লোক বঞ্চিত হওয়াতে—

"Reason, common sense, and the principles of science, have been alike set at defiance for the virtual purpose of obstructing the commerce of England and arresting the progress of improvement in India."

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারকে ও তাদের ভারত-শাসন-নীতিকে তীব্র আক্রমণ করে পুস্তিকাকার লিখলেন—

"It is scarcely necessary to say that the chief remedy for the evils we have pointed out in the foregoing pages is European settlement, or, more explicitly, *the introduction of European example—of European skill—of European enterprize—and of European capital.* (Italics mine—S.T.) The following are samples of the arguments, if we may use such a name for them, which have been adduced by the advocates of monopoly against it. The Indians are a peculiar and a timid race, and if Europeans were permitted to hold lands, they would, in due course, dispossess the native inhabitants. Englishmen are a brutal race of men, excepting always the monopolists and their servants, and, if permitted to mix indiscriminately with the Indians,

they would offer such violence to the peculiar usages of the native inhabitants, that the latter would be utterly disgusted—rebel against their masters and expel these masters from the country. *If Europeans were to settle in India, they would soon colonize the country, and then Great Britain would lose her Indian possessions exactly in the same manner in which she lost her American colonies.* (Italics mine —S. T.). If we civilize the Indians, or, in other words, if we govern them well, these Indians will become wise and enlightened—rebel against us, expel us from the country, and establish a native government. By way of corollary to these ominous and terrible objections, it is directly or indirectly insinuated that the East India Company is the fittest of all human instruments for governing the Indians—that nature, as it were, intended them for each other—from all which it necessarily follows, *that there is no governing India unless the administration monopolizes its commerce* (Italics mine—S. T.)—that the Indians are enamoured of monopolies of the necessaries of life, or of staple articles of trade—that they are generally fond of paying heavy and fluctuating taxes, instead of light and definite ones, such, for example, as paying yearly fifty or fifty-five per cent of the gross produce of the land to the Company, instead of a fixed and moderate land-tax—that they are especially fond of being excluded from all offices of honour, trust, or emolument, having an odd predeliction for placing their lives, liberties, and properties, at the discretion of the Honourable Company—and in short, that all innovation being hateful to them, they abhor change, even when it is from absolute evil to positive good."

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর উপর এই ধরনের তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্যে ভর্তি এই পুস্তিকাটি। নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্য বজায় রাখবার জন্যে নানা অদ্ভুত ধরনের যুক্তি দিয়ে অবুঝ লোকদের ভড়কে দেবার চেষ্টা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর তরফ থেকেও কম করা হয় নি। ইংরেজদের ভারতবর্ষে বসবাস করতে দিলে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হাতছাড়া হয়ে যাবে যেমন করে আমেরিকা ইংলণ্ডের হাতছাড়া হয়েছে—ইংলণ্ডের লোকদের এই ভয় দেখাতে কম্পানী কসুর করেনি সেদিন। কম্পানীর তরফ থেকে পাল্টা আক্রমণও সেদিন বন্ধ ছিল না। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "এশিয়াটিক জর্ণল" একচেটিয়া বাণিজ্য-নীতির সমর্থন করে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যার "এশিয়াটিক জর্ণল"-এ উপরি-উক্ত পুস্তিকাটির সমালোচনা করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বের হয়। সেই প্রবন্ধের এক জায়গায় পুস্তিকাটির লেখককে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে—

"He proceeds to demonstrate, in the same confident manner, that the experiment made in respect to the cultivation of indigo, is

a satisfactory evidence of the efficacy of colonization in British India. Now, it must be surely obvious to the meanest capacity, that a measure conducted upon a secure plan, like that of the permission granted to Europeans to cultivate a single product, in a particular part of the country, under the eye of the local government, let it prove ever so successful, is no evidence whatever in favour of "an unrestricted settlement of Europeans in India." Yet even this slender support fails. The author, indeed, tells his readers that "the introduction of the indigo culture into a district is notoriously the precursor of order, tranquility and satisfaction" ; and that the public *burdens,* before often levied only with the aid of a military force, are punctually discharged ; that in the district of Tirhoot, where the cultivation of indigo has been longest conducted, "the cordiality which subsists between the English planters and the Indians is so remarkable, as to be held up as a model even by the servants of the East India Company themselves, though incapable of assigning the true cause of it." In short, the experiment, he says, "has been productive of unmingled good:" and with his usual confidence, he supports this assertion by a quotation from Bishop Heber, whose good sense and freedom from local prejudices he praises, about "encouraging instead of forbidding the purchase of lands by the English ;" whereas the writer knew (for he has referred to it elsewhere) that Bishop Heber has most distinctly declared, in his confidential correspondence, that "the indigo-planters are always quarrelling with and oppressing the natives, and have done much in those districts where they abound, to sink the English characters in native eyes ;" that the Bishop, in the same letter, justifies the continuation of the power of deportation in the hands of the local government of India, as "the only control which the Company possesses over the indigo-planters ;" and appeals to their misconduct as demonstrating "the absurdity of the system of free colonization which W. is mad about!" A writer, who has the assurance to practise such an impudent deception upon his readers, deserves harsher terms than we think fit to employ."

এই মন্তব্যটি শুধু উপভোগ্য নয়, নানা কারণে প্রণিধানযোগ্যও। অবাধ বাণিজ্যের অধিকার যারা দাবী করছিলো তারা যে বাণিজ্যের একচেটিয়া-অধিকার-ভোগকরনেওয়ালাদের চেয়ে সাত্ত্বিক স্বভাবের লোক ছিলো তা তো মনে হয় না। একচেটিয়া ব্যবসার অধিকারীরা যেমন মুনাফা-লোলুপ, অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দাবীকরনেওয়ালা বণিকরাও ততোখানি

মুনাফা-লোলুপ। ভারতবর্ষের দুঃখদুর্দশার কাহিনীর কথা লোককে শোনানো উভয়ের ক্ষেত্রেই কপটতা এবং ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে বিনিদ্র রজনী যাপন উভয়ের বেলাতেই নিছক অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। একচেটিয়া ব্যবসার অধিকারীরা ভারতবর্ষের ও চীনের বাজার এমন শক্ত করে তাদের মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছিলো যে মাথা গলানো দূরে থাকুক কড়ে আঙ্গুলটিও গলানো অসম্ভব ছিলো সেই মুঠোয় বাঁধা ভারতের ও চীনের বাজারে। একদল বণিক অসম্ভব মুনাফা লুট্ছে আর অন্য এক দল বণিক হাঁ করে দাঁড়িয়ে সেই মুনাফা-লোটা দেখছে এই দৃশ্য উপভোগ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু এই দৃশ্য শিশির-ফোঁটার মতোই ক্ষণিকের। বণিকরা মৌনী থাকার সাধনা করে না। খালি জেবের দুঃখে তাদের জিভ অসম্ভব তাড়াতাড়ি নড়তে থাকে। লাভ করবার লোভে তারা মরিয়া হয়ে লেগে পড়ে অন্য বণিকদের মুনাফার ভাগীদার হবার জন্যে, অন্য বণিকদের মুঠোয়-বাঁধা বাজারে নিজেদের ঠাঁই করে নেবার জন্যে। অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দাবী করছিলো যে ইংরেজ বণিকরা তারাও একচেটিয়া ব্যবসার অধিকারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মত নিজেদের পকেট বোঝাই করার মতলবেই ছিলো। কিন্তু তাদের অজানিতে তারা ইতিহাসের এগিয়ে-চলার কাজে সহায়তা করছিলো। অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসারে বেবাক বণিকদের পৃথিবীর বাজারে ব্যবসা করবার সুযোগ না দিয়ে ক্যাপিটালিজমের সম্প্রসারণ সম্ভব ছিলো না। তাই মুনাফার মধুর গন্ধে ভারতের বাজারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে-থাকা ইংরেজ বণিকদল একটি ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করছিল—কিন্তু আগেই বলেছি যে সেটা তাদের অভিপ্রেত কাজ ছিলো না, সেটা ছিলো তাদের নিজেদের স্বার্থপূরণের by-product।

একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারীদের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের দাবী-করনেওয়ালাদের বাঁও কসাকসির দঙ্গলে নীলকুঠির কথা বার বার উঠেছে। নীলকুঠির মালিকেরা ইংরেজ হলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী তাদের বদনাম করতে ছাড়ে নি। নীলকুঠির সাহেবরা যে সব ভোলানাথ ছিলো তা নয়, ভোলানাথের ঝুলির বাসিন্দেদের সঙ্গেই তাদের মিল ছিল বেশী। তাই তাদের কাণ্ডকারখানা যে অনেক সময়ে ভূতুড়ে ছিল তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের দোষ দেখাবার জন্যে তাদের মুখে যতোটা ছাই মাখাচ্ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী, ততোটা ছাই মাখবার যোগ্যতা তাদের ছিলো না। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে এই নীলকুঠির সাহেবরা যে জাতের জীবই হোক না কেন, তারা যে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলো এবং অর্থোপার্জনের দিক থেকে গ্রামাঞ্চলের চাষীদের, ক্ষেত-মজুরদের ও গ্রামের মধ্যবিত্তদের উন্নতিবিধান করেছিলো, সে বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সমর্থকেরা একটি কথাও বলেন নি।

অবাধবাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা অবাধ বাণিজ্যের সুফল প্রমাণ করবার জন্যে নীলকুঠির সাহেবদের অবতার বলে প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। না এঁদের, না ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর মাতব্বরদের ইতিহাসের গতির নিয়ম সম্বন্ধে কোনো সচেতনতা ছিলো, তাই নীলকুঠির সাহেবদের মুখে একদল খড়ি ঘস্তে ও অন্য দল কালি মাখাতে ব্যস্ত রইলেন। ইতিহাসের ধারা এই দুই দলেরই পাশ দিয়ে বয়ে গেলো। কিন্তু এই ঝগড়ার দৌলতে একটি খবর ফাঁস হয়ে গেলো। অবাধ বাণিজ্যের উপকারিতা প্রমাণ করবার জন্যে অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা বিশপ্ হেবর্-এর মতের উল্লেখ করেছেন। বিশপ্ হেবর্ ভারতবর্ষে এসে যা দেখেছিলেন সে সব লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ জর্ণল-এ। সেই জর্ণল-এ বিশপ্ হেবর্ ভারতবর্ষে ইংরেজদের বসবাস সমর্থন করে লিখেছেন যে,

"জমি কিনতে ইংরেজদের বাধা না দিয়ে, তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত।" তাঁর জর্ণাল-এ বিশপ্ মহোদয় নীলকুঠির সাহেবদের খুব তারিফও করেছেন। তাই অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থকেরা যে বিশপ্ হেবর্-এর দোহাই দেবেন সে তো অতি স্বাভাবিক। "এশিয়াটিক জর্ণাল" এই বিশপ্ মহোদয় সম্বন্ধে ভারী রসালো তথ্য যুগিয়েছেন। "এশিয়াটিক জর্ণাল"-এর মতে বিশপ্ সাহেব তাঁর জর্ণাল-এ যা কিছু ছাপান না কেন, গোপন চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে নীলকুঠির সাহেবদের কাণ্ডকারখানায় ইংরেজ জাতের মুখে কালি মাখানো হচ্ছে। বিশপ্ নাকি এও জানিয়েছিলেন তাঁর গোপন চিঠিতে যে এই নীলকুঠির সাহেবদের ধরে ধরে সাগর পারে চালান করবার অধিকার স্থানীয় গভর্মেণ্টের হাতে থাকার খুবই প্রয়োজন আছে। ইংরেজদের ভারতবর্ষে বসবাস করা নিয়ে যে দাবী করা হয়েছিলো সেই দাবীকেও তিনি অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বিশপ্ হেবরের যে বিশপ্ হবার যোগ্যতা ছিলো তা তাঁর বাইরে এক রকম আর ভিতরে এক রকম, দুরকম মত একই সময়ে পোষণ করবার ও হাজির করবার অসাধারণ লীলা-খেলা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যার "এশিয়াটিক জর্ণাল"-এ এই সমস্যাটি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বের হয়। সেই প্রবন্ধ থেকে বাছাই করে করে প্রয়োজনীয় অংশগুলি তুলে দিচ্ছি—

"We have adverted to the systematic manner in which the anti-monopolists are carrying on their attacks: if the effects produced did not abundantly prove this fact, the indiscretion of some of the party would furnish evidence, for in a recent Calcutta paper of the radical and free-trade complexion, we find a letter—a private letter—said to be addressed to a gentleman in that city, dated "Liverpool, 1st mo. 16th, 1829," and subscribed, "thy sincere friend, James Cropper," which discloses enough to convince us that there is an organized plan of imposture adopted, with a view of throwing dust into the eyes of the good people of England. We insert the opening paragraph of the letter:

My dear friend: Knowing that my friend Robert Benson has written thee very fully on subjects connected with the mission of our mutual friend John Crawford to this country, it has seemed less necessary for me to write to thee. Thou wilt have been so fully informed of all J. Crawfurd labours that I need not repeat them. His work on colonization and free-trade to India seemed so very important, and so well suited for general circulation at this time, that he was recommended to publish a second edition of a large number of copies in a cheap form for general distribution, in which work I believe he is now engaged.

The writer then goes on to tell of the steps taken to excite and

irritate the public mind, part of the plan being that of employing lecturers to go about the manufacturing districts, "to call the attention of the people of this country to the *system of Indian government*, and the vast commercial advantages which would be reaped by a free trade to India and China." He refers to the artful experiment made upon the easy credence of the public and of public writers, by the falsification of the language of the statute, 18 Geo. II, respecting the importation of tea from the continent of Europe by other persons than the Company ; and he significantly adds, "I trust we shall be able to make *a good handle of this,* in a contest which is just opening."

". . . . In the *Times* newspaper of November 9th appeared a long letter addressed to the Duke of Wellington, evidently from the same manufactory which has supplied a multitude of other deceptive productions, wherein his Grace was conjured, out of regard for the sufferings of the operatives throughout the country, and the alarming condition of our revenue, to promote "a really free unfettered trade with the East Indies, and the removal of that most injurious monopoly of the China trade now possessed by the East India Company." The writer bolsters up his theory, as to the prodigious benefit that would accrue to the country from adopting his recommendation, by referring to the wonderful increase of the trade with India, "unprecedented in the annals of commerce" since the admission of speculators into that market ; by urging the obvious utility of an open trade with China—"never, perhaps, were two countries more favourably situated for a beneficial commercial intercourse than Great Britain and China ;" by insisting upon injustice of giving power to the East India Company "to tax the people of this country at the rate of from £1,500,000 to £2,000,000 a year in the shape of an enhanced price of tea ;" and by other assertions of a like character, equally new and equally *veracious.*

This impudent address to the Prime Minister of England provoked a writer, who signs himself "A Volunteer," to animadvert upon its falsehoods in the same paper . . . In less than half the space occupied by the correspondent of his Grace the Prime Minister, the "Volunteer" demolishes the whole fabric of his argument, and convicts him, evidently to the satisfaction of the Editor of the Times himself, of "intentional misrepresentation." He shows, as it has been demon-

strated in this Journal, that the argument deduced from the apparent extension of our Eastern trade, since the renewal of our charter, is a pure fallacy ; that so far from the trade having been beneficial, which is the only ground upon which it can be assumed as a foundation for the theory contended for, it has been ruinous to thousands, and affords, on the contrary, a strong reason against conceding the object which the free trade party so eagerly seek: . . . . The nonsense about colonization the writer disposes of shortly, but satisfactorily: "the argument of Mr Crawfurd," he observes, "in his pamphlet on colonization of India, tends to show the small degree of danger to us, and of inconvenience to the Hindoos, attending the conversion of the latter into mere raisers of raw produce for the employment for the steam engines in Britain. The patient people of Hindostan might, *perhaps* (this qualification is fearfully important), be brought to submit to this extreme wrong ; but shall we purchase an augmentation of our exports by such an atrocious deed of injustice as stains the character of Spain in its dealings towards America?"

. . . . We turn now, with equal pleasure, to another writer, a correspondent also of the Duke of Wellington, but of a somewhat different character. In the *Morning Herald* newspaper of November 24, one of the few journals which have maintained a rigorous impartiality upon this question, and *which has kept its columns pure from the sophistry and fallacies of the anti-monopolists* (Italics mine—S. T.) there appears a letter, the first of a series, addressed to the noble Duke, and signed "Indophilus", which like that of a "Volunteer", merits attention . . . . "Indophilus", discarding the Company's interests entirely from his consideration, takes up the question solely on public grounds ; and "as one of the public" *he offers "to pluck off the treacherous disguise in which this great question is presented to the world by a set of selfish adventurers."* (Italics mine—S. T.). We cannot refrain from quoting the following passage, wherein the writer lays down the true principle upon which the charter-question should be argued, and which harmonizes exactly with our own opinions:

Your Grace well knows that this is not a mere commercial question ; it involves the integrity of our constitution at home, *and the welfare, spiritual as well as temporal, of millions abroad* (Italics

mine—S. T.). Yet hitherto it has been treated by dogmatizing pamphleteers and ill-informed petitioners, as if the only point at issue was, whether the extinction of the East India Company's commercial privileges would or would not extend our export trade, give an additional impulse to our machinery, and lower the price of tea! Such is my disgust and indignation at the systematic imposture which has been practised upon the country, in regard to this single point, that I fell a repugnance to conceding it, even for the sake of agreement. *But let it be assumed, my Lord, that it would be for the advantage of our merchants and manufacturers that the Company's commercial privileges should cease—is the ultimate question decided?* (Italics mine—S. T.).

In addressing a statesman of your Grace's sagacity, it is superfluous for me to observe, that the privileges and immunities with which the Legislature has invested the East India Company, are distinctions conferred upon them not as an incorporated body of traders. Under the peculiar circumstances which have dilated our Eastern possessions into their present vast proportions, the Company have become a limb of the state; and they are so considered in the eye of the law. *Although, in the fashionable, or rather vulgar cant of the day, they are described as a gang of detestable monopolists and swindlers,* (Italics mine—S. T.) the East India Company compose a wonderful engine, a curiously compacted piece of machinery, for the government of a mighty empire, which, such is the anomaly of the case, could not be safely administered by any other vehicle. The beneficial privileges bestowed upon this body constitute the cement which makes the fabric cohere; *take away the commercial character of the Company, and the vital principle of their existence, as a governing power, is at once destroyed* (Italics mine).

No proposition appears at first sight more plausible than that which is urged by the free-traders to mask their insiduous designs. *"Detach from the Company", say they, "their mercantile character, which is incongruous with that of sovereign, and let them continue to rule India as heretofore." No proposition, as your Grace must perceive, can be more absurd. The revenues of India suffice to defray the charges of government; every attempt to increase their amount, even where they are not fixed, is obstinately resisted, as well as every effort to curtail the local expenditure. Whence, then, I would ask*

these ingenious theorists, are the profits to be derived, wherewith the proprietors of India stock are to be remunerated for the use and the risk of their capital? (Italics mine—S. T.)

A second letter had not appeared when this article was written; but we can venture to predict that the writer will find sufficient resources already in print, besides the information which he may possess from local experience or otherwise, to enable him to render his details, as he expressed it, "satisfactory and convincing to his Grace and to the country."

. . . We pledge ourselves . . . to be vigilant at our post, and shall exert ourselves to the utmost *to prevent the country from being led blindfold by "a band of revolutionists" as the writer we have last quoted terms them, whose sole object is their own, not the nation's interests."* (Italics mine—S. T.).

সে দিন ইংলণ্ডে একচেটিয়া বাণিজ্যের উপসত্বভোগী বণিকদের সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার-দাবী-করনেওয়ালা বণিকদের যে লড়াই চলছিলো তার ঝাঁঝটার খাস হল্‌কাটুকু উপভোগ করাবার জন্যে "এশিয়াটিক জর্ণল"-এর প্রবন্ধটির প্রায় সবটাই উপরে উধৃত করেছি। "এশিয়াটিক জর্ণল" ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সমর্থক, তাই বিপক্ষদের উপর তার যেমন রাগ তেমনি ঘৃণা। ডিউক অব ওয়েলিংটন তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে উদ্দেশ্য করে লণ্ডন "টাইম্‌স্"-এ একটি চিঠি বের হয়। পত্র-লেখক অবাধ-বাণিজ্যনীতির সমর্থন করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে ইংলণ্ডের কি ক্ষতি হচ্ছে তার আলোচনা করেন তাঁর চিঠিতে। তিনি বলেন যে চীনদেশ থেকে ইংলণ্ডে চা আমদানী করার ব্যবসাটির একচেটিয়া অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর হাতে থাকায় পনেরো লক্ষ থেকে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড বেশী দিয়ে চা কিন্‌তে হচ্ছে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের। আর যায় কোথা! ভীমরুলের চাকে ঢিল ফেলে যতো না বিপদ, মুনাফার চাকে ঢিল ফেল্‌লে তার চেয়ে অনেক বেশী বিপদ। 'ভলান্‌টিয়ার' এই নামে সই করে একজন চিঠি লিখলেন "টাইম্‌স্"-এ। "এশিয়াটিক জর্ণল্" ভারি খুসি। এই 'ভলান্‌টিয়ার' মহোদয় নাকি অতি অল্প কথা ব্যবহার করেই আগের পত্র-লেখকের সব যুক্তি ধবসিয়ে দিয়েছেন। এই 'ভলান্‌টিয়ার' ভদ্রলোকটির মতে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের ব্যবসা বাড়ার ফলে ভারতবর্ষের হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হয়েছে, তারা ধনেপ্রাণে মারা গেছে। 'ভলান্‌টিয়ার' মিথ্যে কিছু বলেন নি, শুধু দেখা যাচ্ছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার রদ করে সব ব্যবসায়ীদের ভারতের বাজারে মাল পাঠাবার অধিকারের দাবী উঠ্‌তেই তাঁর হঠাৎ হাজার হাজার ভারতবাসীদের দুঃখদুর্দশার কথা মনে পড়ে গেছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে বসবাস করলে ভারতবাসীদের যে কী সর্বনাশ ঘটবে তা কল্পনা করে 'ভলান্‌টিয়ার' আকুল হয়ে পড়েছেন। স্পেন যেমন করে আমেরিকার সর্বনাশ করেছে ইংলণ্ড যেন সেই রকম করে মাল রপ্তানী করে ভারতবর্ষের সর্বনাশ না করে; অর্থাৎ কিনা যা কিছু মাল পাঠাবার তা যেন শুধু কম্পানী পাঠায় অন্য কেউ না পাঠায় এই আবেদন জানিয়েছেন ভদ্রলোক।

তার পরে আর এক ভদ্রলোকের নজির দিয়েছেন "এশিয়াটিক জর্ণল"। এই ভদ্রলোক

'ইণ্ডোফিল্' নামে সই করে এক প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন "মর্ণিং হেরল্ড্" সংবাদপত্রে। এই "মর্ণিং হেরল্ড্" পত্রিকার অপক্ষপাতিত্বের তারিফ করে "এশিয়াটিক জর্ণল" বলছেন যে এই পত্রিকা "একচেটিয়া-বাণিজ্য-অধিকার-বিরোধীদের ভ্রান্ত যুক্তি ও কচ্‌কচানি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে।" অর্থাৎ কিনা এই পত্রিকা একচেটিয়া-বাণিজ্য-অধিকারের বিপক্ষে যারা তাদের কোনো কথা না ছেপে পত্রিকার অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। আর এই 'ইণ্ডোফিল্' যে মহৎ ব্রত নিয়ে দেখা দিয়েছেন তা তাঁর ভাষাতেই হচ্ছে 'একদল স্বার্থান্বেষী লোক একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার বনাম অবাধ-বাণিজ্য-অধিকার—এই বিরাট সমস্যাটিকে যে রকম করে সাজিয়েগুজিয়ে জনসাধারণের সামনে ধরে দিয়েছে, সেই জঘন্য ছদ্মবেশ ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে।' এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে 'ইণ্ডোফিল্' যে খোলা চিঠি ছাপালেন "মর্ণিং হেরল্ড্" পত্রিকায় ডিউক অব ওয়েলিংটনের উদ্দেশ্যে, তার প্রারম্ভেই তিনি লিখলেন—"আপনি ভালো করেই জানেন যে এই ব্যাপার শুধু ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপার নয়, এটি আমাদের নিজেদের দেশের শাসনতন্ত্রের integrityর প্রশ্ন আর অন্য দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক মঙ্গলের প্রশ্ন তোলে।" ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারে হাত পড়লে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের পরমার্থিক ও লৌকিক মঙ্গল যে কি ভাবে চোট খাবে তা ভেবে 'ইণ্ডোফিল্' শিউরে উঠেছেন। যারা চায়ের দাম নিয়ে হৈ-চৈ করছিলো, ইংলণ্ডের রপ্তানী বাড়াবার কথা বল্‌ছিলো কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার রদ করে দিয়ে, তাদের সম্বন্ধে 'ইণ্ডোফিল্'-এর ঘেন্নার আর শেষ নেই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী যে কী 'একটি আশ্চর্য এন্‌জিন, কি অদ্ভুত একটি যন্ত্র', একটি বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করবার জন্য, সে কথা বলেই 'ইণ্ডোফিল্' বল্‌লেন—'কম্পানীর বাণিজ্যের দিকটা সরিয়ে নাও, অম্‌নি তার শাসন-ক্ষমতার অস্তিত্বের প্রধান অবলম্বন ধ্বসে যাবে।' তাই যারা বল্‌ছিলো যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী গভর্মেণ্ট হিসেবে ভারত-শাসন করুক, কিন্তু ভারতে তাদের ব্যবসা বন্ধ করুক কেন না রাজ্য-শাসনের সঙ্গে ব্যবসা মেশানো সঙ্গত নয়, তাদের নির্বুদ্ধিতা (!) বিদ্রূপ করে 'ইণ্ডোফিল্' বল্‌ছেন—"ইণ্ডিয়া ষ্টকের মালিকরা তাঁদের মূলধন ব্যবহার করতে দিয়েছেন ও অনেক ঝক্কি নিয়েছেন; সেই মূলধন ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্যে ও ঝক্কি পোহানোর জন্যে তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে কোথা থেকে যদি না মুনাফা করা যায়?"

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখের "লণ্ডন কুরিয়ের"-এ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের সমর্থনে এইটে বের হোলো—

One of these pamphleteers, who is made much of in a Morning Paper, charges upon the Company, that its monopoly precludes individual industry, and depresses and degrades the agriculture of India. That there may be *individuals* to whom a share of the Company's business would be acceptable we can readily conceive; but we have our doubts whether it can be proved that the effect of the Charter has been so deadly to the productive power of India as the Anti-monopolists assert. This Charter was given in 1813, it has therefore been fifteen years in operation, and if its principle is so hostile to the powers of production, its ravages by this time must have been seen

and felt. Let me turn to the accounts.

In 1814, the import of tea was little more than 26 millions of pound. In six years, under this unhappy Charter, it rose to nearly 28 millions ; and in six years more it rose to an average of more than 29½ millions. Here, then, we have an improvement to the amount of nearly 13½ per cent. The pamphleteer tells us that, under this Charter, the cultivation of cotton wool has fallen off. In 1814 there were imported 2,850,318 lbs. ; in 1826 the import amounted to "only" 21,187,900 lbs.! and in the intermediate years, it has reached as high as 67,456,411 lbs. The person who calls this a symptom of decline is held up in a Morning Paper as "well versed in Indian affairs." He may be, for aught we know, but he certainly is not very well versed in figures." (*London Courier*—May 26, 1828.)

লড়াইটা যতো জমে উঠেছে নীতি ও পরমার্থের আলখাল্লার তলা থেকে মুনাফার ঝোলাঝুলিগুলো ততো ঠেলে বের হয়ে এসেছে। একালের মতো সেকালেও বনেদী স্বার্থের উপর যারাই আঘাত হানতে গেছে তাদের 'বিপ্লবী' বলে ছাপ-দেবার চেষ্টা চলেছে। অবাধ-বাণিজ্যের অধিকারের দাবী করছিলো যারা সেই বণিকদের 'এক গোচ্ছা বিপ্লবী' বলে অভিহিত করে লোক ভড়কাবার চেষ্টা করতে ত্রুটি করেন নি 'ইণ্ডোফিল্' ও "এশিয়াটিক জর্ণল"-এর সম্পাদক।

মতবাদের লড়াই সে সময়ে কি রকম জমে উঠেছিলো ইংলণ্ডে তার চেহারাটা আমরা এতোক্ষণ দেখলুম। অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থকেরা ছিলো দলে ভারী। ভারতের বাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার থাকায় যে সব কলকারখানার মালিকেরা ভারতে মাল পাঠাতে পারছিলো না, তারা সব অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থক হয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীকে চারদিক থেকে আক্রমণ করতে সুরু করেছিলো। শুধু বই লিখে ও সংবাদপত্রে চিঠি-চাপাটি পাঠিয়ে তারা ক্ষান্ত ছিলো না। ইংলণ্ডের নানা সহর থেকে আর্জি আসছিলো পার্লামেণ্টের কাছে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকারের দাবী করে। প্লিমথ্-এর ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, জাহাজ কম্পানীর মালিক ও অন্যান্য বণিকেরা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে এই আবেদনটি পার্লামেণ্টের কাছে পাঠালো—

"The exclusive privileges granted to the East India Company are found by experience to operate prejudicially to the public weal, by the high price of articles of general consumption compared with those of foreign states, where the trade is unshackled by prohibitions and restrictions ; that it is injurious to British enterprize to be prevented from an unrestricted trade to China and other eastern countries, whilst merchants of other countries enjoy it ; they pray, therefore, for a committee of inquiry into the present state of the India and China trade, with a view to the admission of British subjects generally to a participation therein, and to be allowed, in the mean time,

a share in that trade.

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা মে তারিখে গ্লস্টারের (Gloucester) পশমী বস্ত্রের কারখানার মালিকেরা পার্লামেণ্টে আর্জি পাঠালো চীন দেশ ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা করার পথে যে সব আইনগত বাধা আছে সেগুলি দূর করতে। তারা লিখ্‌লো সেই আর্জিতে যে আইনগত বাধাগুলি দূর হলে—

"An almost inexhaustible field might be opened for British industry and enterprize, and from which they are now excluded by a monopoly unworthy of the present enlightened era, and totally unequal to the wants and supply of such immense territories, as well as to the capacities and power of production of the British Empire."

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে সান্‌ডারল্যাণ্ডের (Sunderland) জাহাজ-ব্যবসায়ীরা ও বণিকেরা ভারতের ও চীনের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত কমিটি বসানোর দাবী করে ও অবাধ-বাণিজ্যের সুযোগের দাবী করে পার্লামেণ্টকে জানালো যে—

"A considerable trade has long been enjoyed by foreign merchants conveying by their shipping from China and other eastern countries to various parts of the world the produce of those countries from which the petitioners are excluded by the East India Company, though foreign vessels are laden in British ports with British manufactures for eastern market; that the quality of India cotton is deteriorated by the cultivation being left to the natives, owing to British subjects excluded from investing their capital in land in India for that purpose, whereas the quality of indigo has improved beyond expectation, and the cultivation increased, since it came under British superintendence."

৭ই মে তারিখে বার্মিংহ্যাম-এর চেম্বার অব কমার্স পার্লামেণ্টের কাছে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের দাবী করে লিখ্‌লো—

"All experience since the year 1813 has demonstrated that neither a power to purchase nor a disposition to use commodities of European manufacture are wanted in the natives of British India; and that the petitioners have no doubt that a more free and direct intercourse with China, would prove the existence of a similar disposition and ability in that country; and they pray for an enquiry, during the present session, into the restrictions on the trade, with a view to the eventual removal of every obstruction to our intercourse with British India, China, Southern Asia, and the eastern islands".

লীড্‌স্‌-এর ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিকেরা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে পার্লামেণ্টকে আবেদন জানালো যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর চার্টার পুনর্বার বহাল করবার সময়ে যে তদন্ত করা দরকার সে তদন্ত হওয়া উচিত—

"Not only in reference to a free trade with India and China, but also to the expediency of opening the peninsula of India to colonisation."

ঐ একই তারিখে ওয়েক্‌ফিল্‌ড্‌-এর কারখানার মালিকেরা ও ব্যবসায়ীরা পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্ত করে জানালো যে—

"That the agricultural, commercial and manufacturing interests of the country would be greatly benefited by opening a free trade to India and China ; that the trade in woollens would be thereby increased to a prodigious extent, and Leeds and its neighbourhood be restored to its former prosperity ; that the agriculturist would be benefited by an increased demand for our native clothing wool, now in little request ; and they pray that the monopoly of the Company may be abolished, and a beneficial intercourse with India and China may be laid open to British merchants etc."

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে ম্যান্‌চেষ্টার সহরের ব্যবসায়ীরা ও কারখানার মালিকেরা পার্লামেণ্টকে জানালো—

"That the East India Company's monopoly of the trade in tea is productive of great and obvious injury to the public, and is not attended with equivalent advantage to the revenue ; that the power enjoyed by the Company of summary and arbitrary banishment without legal process from the territories under their control, is a violation of the rights of Englishmen, injurious to the interests of India and Great Britain, unjustifiable on any plea of state necessity, and ought to be suffered no longer to exist, that the happiest consequences might be expected to arise from giving encouragement to the British-born subjects throughout our Indian possessions ; the accumulation and useful employment of Capital would be thereby promoted ; the arts, the civilization and the literature of Europe would spread, and the great blessings of Christianity be peaceably diffused through regions where its name is yet unknown."

ব্রিষ্টল্‌ সহরের ব্যাংকার, ব্যবসাদার ও কারখানার মালিকেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের বিরোধ করে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে পার্লামেণ্টকে জানালো—

"That the removal of existing restrictions will increase the demand for British goods, encourage our industry, agriculture, and shipping, and augment the national revenue ; that it is essential that the right of free settlement in India should be secured to Englishmen, and the country opened to the enterprize of the British public,

whose energies and example would powerfully conduce to the improvement of the people in industry, morality, and religion, to their security, good order, and loyalty, and to the permanence of our connection with India ; that measures characterized by these beneficial tendencies have been introduced, for the most part, by his Majesty's Government, and form a striking contrast with the timid, vacillating policy of the East India Company ; that long-continued and calamitous experience has proved the incompetence of the Company to conduct their commercial, financial, or territorial affairs with advantage to themselves, our eastern empire, or this kingdom."

ঐ একই তারিখের দরখাস্তে লিভারপুল্-এর নাগরিকেরা ও ব্যবসায়ীরা পার্লামেণ্টকে জানালো যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করার সনদ রদ করে দিতে ও সকলকে ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে অবাধ যোগাযোগের সুযোগ দিতে—

"by the entire extinction of the exclusive privileges which that Company have so long enjoyed—privileges at all times unjust and injurious to the country at large, inconsistent with our national rights, and directly opposed to that liberal spirit which characterizes the commercial enactments of the present day."

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে গ্লাস্গো সহরের ব্যবসাদার, কারখানার মালিক ও ব্যাংকারেরা পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে দাবী করলো যে—

"the expediency of removing at the expiration of the East India Company's Charter, all the disability to free commercial intercourse with the countries to the eastward of the Cape of Good Hope ; that in 1793, and 1813, the Legislature limited and restrained the rights and monopoly of the Company in many important particulars, in the face of adverse testimony given by some of the Company's most distinguished servants ; . . . . that the exclusive right of trading to China, and the entire monopoly of the trade in tea, are a most injurious and mischievous grievance to the commercial industry of the country, that the consequence of these exclusive privileges has been, to enable the said Company for many years to dispose of tea at double the price at which a similar quality can be had at any of the continental ports of Europe, or of the United States of America, whose subjects enjoy free intercourse with China, independently altogether of the duties paid to Government, and that from the universal use of this luxury, a heavy tax is thus paid by every individual in the United Kingdom in support of a monopoly, which cramps the national industry by the extensive injury it inflicts

on the commercial operations of individual merchants and private companies engaged in the eastern trade, and which, in its principle, is inconsistent with the natural rights of British subjects trading with countries in amity with their own."

২১শে মে তারিখে ল্যাংক্যাষ্টার-এর ব্যবসায়ীরা ও কলের মালিকরা পার্লামেণ্টকে দরখাস্ত পাঠিয়ে জানালো—

"that the trade to China and the interior of India may be thrown open at the earliest possible period, the monopoly of tea be abolished, the right of His Majesty's subjects to settle in India be established by law, the power of banishment, without trial and conviction of a defined offence, no longer be allowed, and that inquiry may be instituted forthwith into the present condition of all regions within the limits of the East India Company's charter."

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখ ডব্‌লিন সহরের চেম্বার অব কমার্স পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্ত করে জানালো—

"The incalculable advantages which the British empire would derive from a removal of the restrictions on the trade to the East-Indies and China, by increasing and establishing its commercial and manufacturing prospects, and providing against the unfriendly or mistaken regulations of other states ; and that the monopoly of the trade to China is alike unjust in its principles and impolitic in its consequences, and by raising the price of tea far beyond its intrinsic value, it materially aggravates the burthen of national taxation ; praying that the injurious restrictions on the said trade may be removed."

হ্যালাম্‌শায়ার-এর ছুরি-কাঁটা ইত্যাদি নির্মাতাদের কর্পোরেশন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে দরখাস্ত পাঠিয়ে পার্লামেণ্টের কাছে অভিযোগ করলো—

"against restrictions on the trade with India, and the obstacles to all intercourse with its interior ; and that British merchants are excluded from a trade with China by the arbitrary rule and exclusive privileges of the East India Company ; that the price of tea, and other products of China is considerably higher in England than in any other country in Europe, in consequence of the monopoly of the East India Company ; that the hardware trades of Sheffield are in a state of considerable depression, which a free trade with India would mainly tend to alleviate. The petitioners pray for inquiry with a view to admitting British subjects to a free trade with India and China, and a free settlement in India."

এইগুলি ছাড়া আরো অগুন্তি দরখাস্ত ইংলন্ডের প্রায় প্রতিটি কলকারখানাওয়ালা সহর সেদিন পার্লামেন্টের কাছে পাঠিয়েছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর সনদ রদ করে দেবার দাবী ও তাদের সকলকে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দেবার দাবী জানিয়ে।

[ক্রমশঃ]

অচেনা

আলবেয়ার কাম্যু

গ্রেফতার হবার পরই কয়েকবার আমায় জেরা করা হয়। কিন্তু সে সব শুধু মামুলি প্রশ্ন, আমার পরিচয় ইত্যাদি জানবার জন্যে।

প্রথমবার যখন থানায় আমার জবানবন্দী নেওয়া হয় তখন মনে হয়েছিল এ মামলায় কারুর যেন কোন আগ্রহ-ই নেই। এক হপ্তা বাদে দ্বিতীয়বার ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে যখন আমায় নিয়ে যাওয়া হল তখন কিন্তু তিনি যেন বিশেষ একটু আগ্রহ নিয়ে আমায় লক্ষ্য করছেন মনে হল।

অন্যদের মত-ই তিনি প্রথমে আমার নাম ধাম কি কাজ করি কোথায় কখন জন্মেছি এই সব জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর জানতে চাইলেন আমি কোন উকিল দিয়েছি কিনা। বললাম,—না তা দিই নি। এ সম্বন্ধে কিছু আমি ভাবিও নি। উকিল দেওয়া দরকার কিনা জিজ্ঞাসা করলাম।

—এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ? ম্যাজিস্ট্রেট বললেন।

উত্তরে বললেন যে আমার মামলা খুব সোজা বলেই আমার ধারণা। তিনি তাতে হাসলেন। বললেন,—তোমার কাছে সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের আইন মাফিক বিচার করতে হবে। তুমি যদি কোন উকিলকে না লাগাও, আদালত থেকেই তোমার জন্যে একজন উকিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকার যে এ সব দিকেও দৃষ্টি দেন এ ব্যবস্থা আমার ভালোই লাগল। ম্যাজিস্ট্রেটকে সে কথা জানালাম। ম্যাজিস্ট্রেট সায় দিয়ে বললেন বিচারের আইন কানুনে খুঁত ধরবার কিছু নেই।

গোড়ায় ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন গুরুতর বলে মনেই হয় নি। যেখানে আমার জবানবন্দী নেওয়া হচ্ছিল সেটা সাধারণ একটা বসবার ঘরের মত। জানলায় পর্দা দেওয়া। ডেস্কের ওপর একটি মাত্র ল্যাম্প। যে কেদারায় আমায় বসান হয়েছিল আলোটা তার ওপরই পড়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের নিজের মুখটা ছিল অন্ধকারে।

এ ধরনের দৃশ্যের বর্ণনা আমি বইয়ে পড়েছি। প্রথমে ব্যাপারটা ছেলেমানুষী বলে মনে হচ্ছিল। কথাবার্তা শেষ হবার পর আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। বেশ লম্বা মানুষ। সুপুরুষ বলা যায়। বসা নীল চোখ পাকা লম্বা গোঁফ আর মাথায় একেবারে তুষারের মত শাদা এক রাশ পাকা চুল। তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেই মনে হল। সবসুদ্ধ লোকটিকে ভালোই লাগে। শুধু একটা ব্যাপারে একটু ধাক্কা খেতে হয়। তাঁর মুখটা থেকে থেকে কেমন বিশ্রীভাবে বেঁকে যায়। কোনরকম স্নায়বিক কাঁপুনি বোধ হয়। তিনি যখন যাবার জন্যে উঠলেন আমি প্রায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ফেলেছিলাম। ঠিক মুহূর্তে মনে পড়ল যে আমি একজনকে খুন করেছি।

পরের দিন আমার জেলের কুঠুরিতে একজন উকিল এলেন। ছোট্টখাট্ট গোলগাল কমবয়েসী মানুষটি। মাথার কালো চুল সযত্নে পাট করা। এই গরমেও তিনি আঁটসাঁট কড়া কলার-এর সঙ্গে কালো পোশাক পরে এসেছেন। শাদা কালো ডোরা কাটা গলার

টাইটা বেশ বাহারে। আমার গায়ে শুধু হাতাগুটোন সার্ট।

খাটের ওপর ব্রীফ কেসটা রেখে তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন যে আমার মামলার সমস্ত বিবরণ তিনি খুব মন দিয়ে পড়েছেন। ব্যাপারটা তাঁর মতে সাবধানে সামলান দরকার। তবে তাঁর পরামর্শ মত চললে আমার ছাড়া পাওয়া শক্ত হবে না। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

—ভালো! এবার তাহলে আসল কাজে নামা যাক। বলে তিনি বিছানার ওপর বসলেন। তারপর জানালেন যে আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া চলছে। আমার মা যে সম্প্রতি আতুরাশ্রমে মারা গেছেন তা ওরা জানে। মারেঙ্গোতে তদন্ত করা হয়েছে আর পুলিস শুনেছে যে মার শেষকৃত্যের সময় আমি নাকি অত্যন্ত অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়েছি।

—বুঝতেই পারছেন, উকিল বললেন, যে এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে আপনাকে জেরা করা আমি পছন্দ করি না। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ গুরুতর আর ওই নির্বিকার অগ্রাহ্যের ভাব বলতে যা ওরা বোঝাচ্ছে তা যদি আমি কাটিয়ে দিতে না পারি তাহলে আপনার হয়ে ওকালতি করতে বেগ পেতে হবে। এই বিষয়ে আপনি, শুধু আপনিই আমায় সাহায্য করতে পারেন।

আমি সেই বিশেষ দিনটিতে দুঃখ পেয়েছিলাম কিনা তিনি এবার জানতে চাইলেন। প্রশ্নটা আমার কাছে সত্যি অদ্ভুত লাগল। এরকম কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে আমার তো খুবই অস্বস্তি লাগত।

বললাম যে ইদানীং কখন কি মনে হয় বা না হয় তা লক্ষ্য বড় একটা করি না। তাই কি উত্তর দেব ঠিক ভেবে পাচ্ছি না। মাকে যে বেশ ভালবাসতাম একথা সত্যি, কিন্তু এ কথার তেমন কিছু তাৎপর্য বোধ হয় নেই। একটু ভেবে বললাম যে সাধারণ সব মানুষই বোধ হয় কোনো না কোনো সময়ে যাদের ভালবাসে কম বেশী তাদের মৃত্যু কামনা করে।

উকিল বেশ একটু বিচলিতভাবে আমায় বাধা দিয়ে বললেন,—মামলার সময় বা এখন যিনি পরীক্ষা করছেন সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খবরদার যেন এরকম কোনো কিছু বলবেন না। আমায় কথা দিন।

তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে সেই কথাই দিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে বুঝিয়ে বললাম যে আমার মন মেজাজ আমার শরীর কি রকম থাকে না থাকে তার ওপর সব নির্ভর করে। যেমন মার শেষকৃত্যের দিন ক্লান্তিতে আমার কেমন একটা আচ্ছন্ন অবস্থা হয়েছিল। কি হচ্ছে না হচ্ছে ভালো করে টেরই যেন পাই নি। তবে এটুকু তাঁকে জানাতে পারি যে মা না মারা গেলেই ভালো হত বলে আমার মনে হয়।

উকিলকে তবু যেন অসন্তুষ্ট মনে হল। সংক্ষেপে বললেন, ওইটুকু যথেষ্ট নয়।

খানিক কি ভেবে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে সেদিন আমার মনের ভাব আমি চেপে রেখেছিলাম একথা তিনি বলতে পারেন কিনা।

—না, জবাব দিলাম, সেটা ঠিক সত্য হবে না।

তিনি কেমন অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকালেন, আমি যেন ঘৃণ্য গোছের কিছু। তারপর প্রায় বিরূপ স্বরেই বললেন যে আতুরাশ্রমের পরিচালক ও কয়েকজন কর্মীকে সাক্ষী হিসেবে ডাকাতেই হবে।

—তাতে আপনার বেশ ক্ষতি হতে পারে, বলে তিনি বক্তব্য শেষ করলেন।

আমি বলতে গেলাম যে আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তার সঙ্গে মার মৃত্যুর কোনো

সম্পর্কই নেই। তিনি তাতে শুধু বললেন, যে আমার এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আইন আদালতের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় কখনো হয় নি।

খানিক বাদে বেশ বিরক্ত মুখেই তিনি চলে গেলেন। মনে হচ্ছিল তিনি আর একটু থাকলে ভালো হত। তাহলে হয়তো তাঁকে বোঝাতে পারতাম যে আমার হয়ে আরো ভালো ওকালতি করবার জন্যে নয়, বরং বলা যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর সহানুভূতি আমি চাইছিলাম। বুঝতে পারছিলাম যে তাঁর মেজাজ আমি খিচড়ে দিয়েছি। আমাকে তিনি ঠিক বুঝতে পারেন নি আর তাইতেই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। দু একবার ইচ্ছে হয়েছিল বলি যে আমি আর সকলের মতই নেহাৎ সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হত না বোধ হয়। তাই কতকটা উৎসাহের অভাবেই কিছু আর বলি নি।

সেই দিনই পরে আবার আমায় ম্যাজিস্ট্রেটের কামরায় নিয়ে যাওয়া হল। বেলা তখন দুটো। ঘরটা তখন আলোয় আলো। জানলায় মাত্র পাতলা একটা পর্দা ঝোলান—অসহ্য গরম।

আমায় বসতে বলে ম্যাজিস্ট্রেট অত্যন্ত ভদ্রভাবে জানালেন যে, 'অপ্রত্যাশিত কারণে' আমার উকিল উপস্থিত থাকতে পারছেন না। সুতরাং তাঁর প্রশ্নের জবাব আমার উকিল না আসা পর্যন্ত আমি ইচ্ছে করলে না দিতে পারি।

বললাম যে আমার জবাব আমি নিজেই দিতে পারব।

ম্যাজিস্ট্রেট একটা টেপা ঘণ্টা বাজালেন। একজন কেরানী এসে ঠিক আমার পিছনে বসল। তারপর আমি ও ম্যাজিস্ট্রেট নিজেদের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবার পর পরীক্ষা শুরু হল।

ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমেই মন্তব্য করলেন যে আমি অত্যন্ত চাপা ও আত্মসর্বস্ব লোক বলে অনেকের ধারণা। এ-বিষয়ে আমার কিছু বলবার থাকলে তিনি শুনতে চান।

বললাম,—দেখুন আমার বলবার কথা কিছু একটা বড় থাকে না, তার জন্যেই সাধারণত চুপ করে থাকি। আগের বারের মত তিনি একটু হেসে স্বীকার করলেন যে কারণটা সঙ্গত বটে।—যাই হোক ওতে কিছু আসে যায় না, বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ে আমার চোখের দিকে চেয়ে একটু গলা চড়িয়ে আবার বললেন,—আপনার সত্যিকার কৌতূহল আপনার নিজের সম্বন্ধে।

তিনি কি বলতে চাইছেন ঠিক বুঝতে না পেরে কোনো জবাব দিলাম না।

তিনি আবার বললেন,—আপনার এই অপরাধের ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস আমার কাছে দুর্বোধ্য। আশা করি সেগুলো আমায় বুঝতে দিতে সাহায্য করবেন।

ব্যাপারটার মধ্যে জটিল কিছু নেই বলায় তিনি সেদিন যা যা আমি করেছি তার বিবরণ চাইলেন। আমি অবশ্য প্রথম পরীক্ষার সময়েই সংক্ষেপে তাঁকে সব কথাই বলেছি, রেমণ্ড, বালির চড়া, আমাদের সাঁতার কাটা, মারামারি, তারপর আবার চড়ায় আসা আর পাঁচবার গুলি করার কথা।

তবু আবার সব কিছুই তাঁকে বললাম। থেকে থেকে 'ঠিক! ঠিক!' বলে তিনি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গেলেন। বালির ওপর এলিয়ে পড়া লাশটার কথা বলতে তিনি আরো জোরে মাথা নেড়ে বললেন,—আচ্ছা! আচ্ছা!

একই গল্প দুবার বলে আমি তখন থকে গেছি। মনে হচ্ছিল জীবনে কখনো এত কথা বলি নি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন যে আমাকে তিনি সাহায্য করতে চান কারণ আমার সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল। ভগবানের দয়ায় আমার এই বিপদে কিছু উপকার তিনি করতে পারবেন আশা করেন। তবে আরো কয়েকটা কথা তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করতে চান।

সরাসরি তিনি এবার জানতে চাইলেন, আমি মাকে ভালবাসতাম কিনা।

বললাম,—হ্যাঁ বাসতাম। যেমন সবাই বাসে।

আমার পেছনে বসে যে কেরানী একভাবে টাইপ করে যাচ্ছিল সে হঠাৎ থেমে গিয়ে টাইপ মেশিনের রোলারটা টেনে পিছিয়ে দিয়ে কি যেন কাটাকাটি করলে। হয়ত ভুল কোনো চাবিতে তার হাত পড়ে গিয়েছিল।

এর পর প্রায় অসংলগ্ন ভাবেই—ম্যাজিস্ট্রেট আরেকটা প্রশ্ন করলেন,—পর পর পাঁচবার গুলি করেছিলেন কেন?

একটু ভেবে নিয়ে বললাম যে ঠিক পর পর গুলি করি নি। প্রথম গুলির পর একটু থেমে আর চারবার গুলি করি।

—প্রথম গুলির পর থেমেছিলেন কেন?

আবার যেন আমার চোখের সামনে সব কিছু ভেসে উঠল। বালির চড়ার সেই গনগনে তাত, চোখ মুখ ঝলসানো সেই হলকা। এবার কোনো জবাব দিলাম না।

নিস্তব্ধ মুহূর্ত কটায় ম্যাজিস্ট্রেটকে যেন অস্থির মনে হল। একবার চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালালেন, একবার বসলেন, একটু উঠে আবার বসে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত টেবিলের ওপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে অদ্ভুতভাবে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কিন্তু কেন? যে লোকটা পড়ে গেছে তার ওপর পরপর গুলি চালিয়ে গেলেন কেন?

এবারও কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

ম্যাজিস্ট্রেট কপালের ওপর ডান হাতটা একবার বুলিয়ে নিয়ে ভিন্ন স্বরে এবার বললেন,—আমি জানতে চাইছি কেন আপনি ওরকম করেছিলেন। আপনাকে বলতেই হবে।

তবু চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে পেছনের দেওয়ালে দাঁড় করানো ফাইল রাখবার দেরাজটার কাছে তিনি এগিয়ে গেলেন। একটা ডালা টেনে তা থেকে রুপোর একটা ক্রুশ বার করে তিনি সেটা দোলাতে দোলাতে আবার টেবিলে ফিরে এলেন।

—এটা কি আপনি জানেন? তাঁর গলা তখন একেবারে বদলে গেছে। আবেগে তা কম্পমান।

বললাম,—নিশ্চয় জানি।

তাঁর কথা এই থেকেই শুরু হয়ে গেল। এক নিঃশ্বাসে যেন তিনি বলে যেতে লাগলেন তাঁর যা বলবার। বললেন যে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করেন। অতি বড় পাপীও ঈশ্বরের ক্ষমা পেতে পারে বলে তাঁর ধারণা। কিন্তু তার জন্যে অনুতাপ করা চাই। শিশুর মত সরল বিশ্বাস ও নির্ভরতা চাই। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি ক্রুশটা আমার চোখের সামনে নাড়ছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি তাঁর সব কথা ঠিক মত বুঝতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। প্রথমতঃ কামরাটা এত গরম যে দম বন্ধ হয়ে যায়। বড় বড় মাছি তার ওপর চারিদিকে

ভনভন করতে করতে মাঝে মাঝে আমার মুখে গালে এসে বসছিল। তা ছাড়া তাঁকে দেখে কেমন যেন ভয় করছিল এখন।

অপরাধী যখন আমি নিজে তখন অবশ্য এ-রকম মনের ভাব হওয়াটা যে অন্যায় তা বুঝতে পারছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেটের কথা তাই যথাসাধ্য বোঝবার চেষ্টা করলাম। তাঁর কথায় যা বুঝলাম তা এই, প্রথমবার গুলি করার পর দ্বিতীয় গুলি চালাবার আগে কেন আমি থেমেছিলাম আমার স্বীকারোক্তিতে এইটুকুর মানে পাওয়া একান্ত দরকার। অন্য সব কিছুর বলতে গেলে একরকম অর্থ পাওয়া যায়, শুধু এই ব্যাপারটিই তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়।

এই সামান্য ব্যাপারটার ওপর অত জোর দেওয়া উচিত নয় এইটিই তাঁকে এবার বোঝাতে গেলাম কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি কিনা।

না, বলে জবাব দিতেই তিনি অপ্রসন্নভাবে চেয়ারে বসে পড়লেন।

—তা হতেই পারে না। তিনি আমায় এবার বোঝাতে চেষ্টা করলেন। বললেন যে যারা ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে তারাও তাঁকে মানে। এ-বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহই নেই। সন্দেহ কখনো হলে তাঁর জীবনেরই কোনো মানে থাকবে না।

—আপনি কি চান যে আমার জীবনের কোনো অর্থ না থাকে? ম্যাজিস্ট্রেট বিক্ষুব্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার চাওয়া না চাওয়ার কি সম্পর্ক এ-বিষয়ের সঙ্গে থাকতে পারে বুঝতে পারলাম না। তাঁকেও তাই বললাম।

আমার কথার মধ্যেই ক্রুশটা আমার মুখের কাছে বাড়িয়ে ধরে তিনি চীৎকার করে উঠলেন,—আমি অন্ততঃ খ্রীষ্টান আর তোমার পাপের জন্য যেন তিনি তোমায় ক্ষমা করেন এই প্রার্থনাই আমি করব।

বেচারা ছোকরা বলে আমায় সম্বোধন করে তিনি তারপর বললেন,—যীশু যে তোমার জন্যেই যন্ত্রণা সয়েছেন এ তুমি বিশ্বাস না করে পারো?

'বেচারা ছোকরা!' বলবার সময় তাঁর গলার সত্যিকার আকুলতাটা লক্ষ্য করলাম, কিন্তু তখন কিছু আর আমার ভালো লাগছে না। ঘরটা ক্রমশই আরো গরম হয়ে উঠছিল।

কারুর আলাপে দিক ধরে গেলে যা সাধারণত আমি করি এখনও তাই করলাম। তাঁর কথায় সায় দিয়ে ফেললাম। অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

—দেখলে! দেখলে! এখনও কি মানো না যে তাঁর ওপর তোমার বিশ্বাস ও নির্ভরতা আছে?

বোধ হয় মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিলাম, কারণ তিনি যেন হতাশভাবে চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ টাইপরাইটারের শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোনো আওয়াজ নেই। আমাদের মৌনতার ফাঁকটুকুতে টাইপরাইটার যেন শেষ মন্তব্যের নাগাল ধরে নিলে।

ম্যাজিস্ট্রেট এবার কেমন করুণ অথচ একাগ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

—সারা জীবনে তোমার মত এমন পাথরের মত অসাড়-হয়ে-যাওয়া কাউকে আমি দেখি নি। চাপা গলায় তিনি বললেন,—যে সব অপরাধী আমার কাছে এসেছে, সবাই তারা যীশুর যন্ত্রণার এই প্রতীক দেখে কেঁদেছে।

বলতে যাচ্ছিলাম যে তারা অপরাধী বলেই কেঁদেছে। কিন্তু তখনই মনে পড়ল যে আমি নিজেও তাই। কি জানি কেন নিজের সম্বন্ধে ওই ধারণাটা মনকে মানাতে পারি নি।

আমাদের সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেছে বোঝাবার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট এবার উঠে দাঁড়ালেন। আগেকার মতই ক্লান্ত স্বরে আমাকে শেষবার প্রশ্ন করলেন, যা করেছি তার জন্যে আমি অনুতপ্ত কিনা।

একটু ভেবে নিয়ে বললাম যে আমার মনের অনুভূতিতে অনুতাপের চেয়ে কি রকম একটা বিরক্তির ভাবই যেন বেশী। এর চেয়ে আর কোনো ভালো শব্দ পেলাম না। কিন্তু তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারলেন না।

সে দিনের পরীক্ষা ওইখানেই শেষ হল।

তারপর আরেকবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হতে হয়েছে। তবে আমার উকিল প্রত্যেকবারই সংগে ছিলেন। এসব পরীক্ষায় আমায় আগের বিবরণ বিশদ করতেই শুধু ডাকা হয়েছে। কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট ও আমার উকিল আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সে সময় আমাকে যেন কেউ লক্ষ্যই করতেন না।

যাই হোক পরীক্ষার ধরণ ক্রমশ বদলেই যাচ্ছে দেখলাম। আমার সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের সে কৌতূহল আর নেই। মামলা সম্বন্ধে তিনি যেন একটা সিদ্ধান্তে পেঁছে গেছেন। ঈশ্বরের কথা আর তিনি বলেন নি তারপর, প্রথম সাক্ষাতের সময় যাতে অত অস্বস্তিবোধ করেছিলাম সেই ধর্মের উচ্ছ্বাসও দেখান নি। ফলে আমাদের সম্পর্কটা যেন আরো প্রীতির হয়ে উঠেছে। কিছু জিজ্ঞাসাপত্রের পর উকিলের সংগে একটু আলাপ করে ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষা শেষ করে দেন। মামলা যথারীতি এগুচ্ছে এই হল তাঁর বক্তব্য। কখনো কখনো সাধারণ বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট ও আমার উকিল আমাকেও তাতে যোগ দিতে উৎসাহ দেন। আমি আগের চেয়ে অনেক সহজ হতে পারছি। এসব আলোচনার সময় ওঁদের দুজনের কাউকেই আমার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরূপ মনে হয় না। সব কিছু এমন মসৃণ সৌজন্যের সংগে সারা হয় যে ধারণাটা বিসদৃশ হলেও আমার মনে হয় আমি যেন ওঁদের পরিবারেরই একজন।

অকপটভাবেই বলছি যে এগারো মাস ধরে ওই পরীক্ষার সময় ওঁদের সংগ পাওয়ায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষাৎকার শেষ হবার পর আমায় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যে ক'টিবার পিঠ চাপড়ে 'নাস্তিক হে, আজ তাহলে এই পর্যন্ত!' বলেছেন সেই বিরল মুহূর্তগুলির চেয়ে আর কিছু কখনো বেশী ভাল লেগেছে যেন ভাবতেই পারি না।

পরীক্ষার পর আবার জেলের লোকের হাতেই আমায় দেওয়া হত।

কয়েকটি বিষয়ে কথা বলার প্রবৃত্তি কোনো কালেই আমার হয় নি। জেলে আসবার কয়েকদিন পরে মনে হয়েছিল যে আমার জীবনের এই অধ্যায়টাও সেই রকম একটা বিতৃষ্ণাজনক ব্যাপার।

কিন্তু কিছুদিন কাটবার পর মনে হল এই বিতৃষ্ণার কোনো সত্যিকার হেতু নেই।

সত্যি কথা বলতে গেলে প্রথম দিকে জেলে যে আছি তাই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারি নি। কি রকম অস্পষ্ট একটা আশা তখন ছিল যে কিছু একটা শীগগীরই হবে— খুশি ও অবাককরা কিছু।

মারী দেখা করতে আসার পরই পরিবর্তনটা ঘটল। মারী ওই একবারই দেখা করতে এসেছিল। যেদিন তার চিঠিতে জানলাম যে আমার বিবাহিত স্ত্রী নয় বলে তাকে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না, সেইদিনই আমি বুঝলাম জেলের এই কুঠুরিই আমার শেষ আশ্রয়—কানাগলির মত যা থেকে সামনের পথ রুদ্ধ বলা যায়।

যেদিন গ্রেফতার হই সেদিন আমায় আরো কয়েকজন কয়েদীর সঙ্গে বড় গোছের একটা ঘরে রাখা হয়। কয়েদীদের বেশীর ভাগই আরব।

আমাকে ঢুকতে দেখে তারা মুচকে হেসেছিল তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল আমি কি করেছি। একজন আরবকে খুন করেছি বলায় তারা কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেছিল। কিন্তু রাত হলে তাদেরই একজন কি করে শোবার তোষক পাততে হয় আমায় শিখিয়ে দিলে।

এক দিক মুড়ে গোল করে পাকিয়ে বালিশের মত করে তোলাই নিয়ম। সারা রাত মুখের ওপর পোকা চরে বেড়াচ্ছে টের পেলাম।

কিছুদিন বাদে আমায় একটি কুঠুরিতে একলা রাখা হল। দেয়ালে কব্জা দিয়ে লাগান একটা তক্তার ওপর আমি শুতাম। কুঠুরিটায় আর দুটিমাত্র আসবাব। একটা পাইখানা ইত্যাদি প্রয়োজনের বালতি আর একটা গামলা।

একটা ঢালু জমির ওপরে জেলখানাটা। কুঠুরির ছোট্ট জানলা দিয়ে আমি সমুদ্রের আভাস পেতাম।

একদিন জানলার গরাদ ধরে ঝোলা অবস্থায় সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর আলোর খেলা দেখবার চেষ্টা করছি এমন সময়ে একজন পাহারাদার এসে জানালে কে একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ভাবলাম, নিশ্চয়ই মারী। ঠিকই ধরেছিলাম।

বাইরের লোকেদের সঙ্গে যে ঘরে কয়েদীদের দেখা করতে দেওয়া হয় সেখানে প্রথমে একটা ঘেরা বারান্দা দিয়ে গিয়ে কয়েক ধাপ উঠে আবার একটা করিডর দিয়ে যেতে হয়।

ঘরটা বেশ বড়। একদিকে একটা বড় জানলা দিয়ে প্রচুর আলো আসে। উঁচু লোহার গরাদের সারি দিয়ে ঘরটা তিন ভাগে ভাগ-করা। এক লোহার গরাদের সারি থেকে আর এক সারির তফাৎ প্রায় কুড়ি হাত। মাঝখানের জায়গাটা কয়েদী আর তাদের বন্ধু দর্শকদের মধ্যে যেন একটা বেওয়ারিশ এলাকা।

আমায় মারীর ঠিক সামনা সামনি এক জায়গায় গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। মারী তার সেই ডোরাকাটা পোশাকটা পরে এসেছে।

গরাদের ধারে আমাদের দিকে আমরা প্রায় বারোজন কয়েদী—বেশীর ভাগই আরব। মারীর দিকে বেশীর ভাগই মুর স্ত্রীলোক। মারীর এক ধারে ছোট্টখাট্ট এক বুড়ি, ঠোঁট দুটো তার চাপা, আরেক ধারে মোটাসোটা এক ভারিক্কী স্ত্রীলোক। হাত পা নেড়ে কাঁসার মত খনখনে গলায় সে অনবরত চেঁচাচ্ছে। মারী এ দুজনের মাঝখানে যেন চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে আছে। দু দিকের তফাৎটা অনেকখানি হওয়ায় আমাকেও দেখলাম গলা চড়াতে হচ্ছে।

ঘরে প্রথম ঢুকে চারিদিকের হট্টগোলে আর জানলা দিয়ে আসা চোখ ঝলসানো আলোয় মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। আমার কুঠুরিটা নিস্তব্ধ আর অন্ধকার। এখানকার

অবস্থাটা সইয়ে নিতে তাই কয়েক মুহূর্ত লাগল। কিছুক্ষণ বাদেই সকলের মুখ কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম—যেন থিয়েটারের আলো তাদের ওপর ফেলা হয়েছে।

মাঝখানের বেওয়ারিশ এলাকার দুধারে দুজন জেলের কর্মচারী বসে আছে এবার চোখে পড়ল। এদেশী কয়েদী আর তাদের আত্মীয় বন্ধুরা পরস্পরের মুখোমুখী মেঝেয় বসে। তাদের কারুর গলা চড়া নয়। এই গোলমালের ভেতরও তারা প্রায় চাপা গলাতেই কথাবার্তা চালাচ্ছে দেখলাম। নিচের গুঞ্জন ওপরের কথাবার্তার সঙ্গে যেন তাল রেখে চলেছে মনে হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কিছু দেখে নিয়ে আমি গরাদের কাছে এগিয়ে দাঁড়ালাম। মারী রোদ লাগানো ঈষৎ তামাটে মুখটা গরাদের ওপর চেপে ধরে প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করছে। মনে হল ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু সে কথা তাকে বলতে পারলাম না।

—তারপর? গলা চড়িয়ে মারী জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি রকম? ভালো আছ তো? যা দরকার সব পাচ্ছ?

—হ্যাঁ যা চাই সবই পাচ্ছি।

কয়েক মুহূর্ত দুজনেই তারপর চুপ। মারী তখনও হাসছে। ওদিকের মোটা স্ত্রীলোকটি আমার পাশের কয়েদীকে উদ্দেশ করে চেঁচাচ্ছে। কয়েদী তার স্বামীই হবে বোধ হয়। লম্বা ফর্সা সুদর্শন চেহারা।

মোটা স্ত্রীলোকটি ওধার থেকে চেঁচিয়ে বললে,—জিনী ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না।

—তাহলে তো মুস্কিল দেখছি! আমার পাশের কয়েদী বললে।

—হ্যাঁ, আমি তবু জিনীকে বললাম যে তুমি ছাড়া পেয়েই ওকে আবার কাজে নেবে। কিন্তু জিনী সে কথায় কানই দিলে না।

মারী চীৎকার করে জানালে যে রেমণ্ড আমায় শুভেচ্ছা জানিয়েছে। বললাম, ধন্যবাদ দিও। কিন্তু আমার কথা আমার পাশের কয়েদীর চীৎকারে চাপা পড়ে গেল। সে তখন বলছে,—হ্যাঁ নেব যদি বহাল তবিয়তে থাকে।

মোটা স্ত্রীলোকটি হেসে উঠল,—বহাল তবিয়ৎ! তাই বটে! একেবারে তাজা জোয়ান।

আমার বাঁ পাশের কয়েদী এখনো পর্যন্ত একেবারে চুপ। অল্পবয়সী ছোকরা। সরু সরু হাতগুলো মেয়েদের মত। দেখলাম ওধারের বৃদ্ধার দিকে একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে। বৃদ্ধার চোখেও ক্ষুধাতুর স্নেহের দৃষ্টি। তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মারীর কথা এবার শুনতে হল। মারী চেঁচিয়ে আমায় সাহস দিচ্ছে,—আশা যেন আমরা না ছাড়ি।

—না কিছুতেই ছাড়ব না। বললাম। তার কাঁধ দুটোর দিকে চোখ পড়ল। হঠাৎ অদম্য একটা ইচ্ছা হল। পাৎলা পোশাকের তলায় কাঁধ দুটোকে চেপে ধরে আদর করতে। পোশাকের মোলায়েম রেশমী জেল্লা আমার চোখ টেনে নিচ্ছে। কেমন যেন মনে হল যে আশার কথা সে বলছে তার সঙ্গে এই অনুভূতিটা জড়িত। বোধ হয় মারীর মনেও ওই রকম কিছু ভাব জেগে থাকবে, কারণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসতে লাগল।

—দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আমরা বিয়ে করব।

এখন শুধু তার শাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো আর চোখের ধারের কুঞ্চনটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম।

—সত্যি তাই ভাবছ? জিজ্ঞাসা করলাম। প্রশ্ন করবার জন্যে ঠিক নয় শুধু জবাবে

কিছু বলতে হয় বলে।

আগেকার মত চড়া গলায় সে তাড়াতাড়ি বলতে লাগল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি নিশ্চয়ই ছাড়া পাবে। আর আবার আমরা সমুদ্রে স্নান করতে যাব। প্রতি রবিবার।

মোটা স্ত্রীলোকটি তখনও চেঁচাচ্ছে। স্বামীকে সে জানাচ্ছে যে জেলখানার আফিসে স্বামীর জন্যে একটা ঝুড়ি সে রেখে এসেছে। ঝুড়িতে কি কি আছে তার ফিরিস্তি দিয়ে স্বামীকে সে সাবধানে সেগুলো মিলিয়ে নিতে উপদেশ দিলে। জানালে যে জিনিসগুলোতে বেশ খরচ পড়েছে।

আমার বাঁ ধারের ছোকরা আর তার মা তখনও নীরবে করুণভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে। নিচে দেশী লোকেদের গুঞ্জন সমানে চলেছে। জানলা দিয়ে বাইরের রৌদ্রের আলো যেন জোয়ারের মত বয়ে আসছে, সকলের মুখে হলদে তেলের পোঁচ বুলিয়ে দিয়ে।

আমার যেন কেমন বিশ্রী লাগছিল এবার। যেতে পারলে বাঁচি। মোটা স্ত্রীলোকটির খনখনে গলায় কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে, তবু মারীর সঙ্গ যতখানি সম্ভব পাওয়ার জন্যে মন উৎসুক।

কতক্ষণ যে কেটে গেছিল বলতে পারি না। মারী সেই একরকম হাসিমুখে তার কাজের কথা বলে গেছিল মনে আছে। এক মুহূর্তের জন্যে গোলমাল চেঁচামেচির বিরাম নেই। আর সারাক্ষণ সেই চাপা গুঞ্জন। এরই মধ্যে সেই ছোকরা আর তার বৃদ্ধা মার নীরবতা যেন শান্তির সরোবরের মত।

তারপর এক এক করে আরবদের নিয়ে যাওয়া হল। প্রথমজনকে নিয়ে যাবার পর প্রায় সকলেই একবার দুয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

বৃদ্ধা গরাদের গায়ে নিজেকে চেপে ধরে আছে। একজন পাহারাদার এসে ছোকরার পিঠে টোকা দিলে।

—আসি মা। ছোকরা বলে উঠল। বৃদ্ধা একটা হাত গরাদের ভেতর দিয়ে গলিয়ে আস্তে আস্তে তখন নাড়ছে।

বৃদ্ধা চলে যেতেই টুপি হাতে আর একজন এসে তার জায়গা নিলে। আমার পাশের খালি জায়গাতেও আর একজন কয়েদী এসে দাঁড়াল। তারা দুজনে গলার স্বর না চড়িয়েই দ্রুত আলাপ চালাতে লাগল। কারণ ঘরটা হঠাৎ অনেক নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। আমার পাশের লোকটির এবার যাবার পালা। চেঁচাবার আর দরকার না থাকলেও তার স্ত্রী চীৎকার করে তাকে সাবধান করে দিলে,—সাবধানে থেকো, আর গোঁয়ার্তুমী কিছু করে বোসো না যেন।

এইবার আমাকে যেতে হচ্ছে। মারী আমার দিকে একটা চুমু ছুড়ে দেবার ভঙ্গী করলে। সে তখনো ঠিক একভাবে গরাদগুলোর ওপর মুখ চেপে ধরে সেইরকম ব্যগ্র হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুদিন বাদেই মারীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তখন থেকেই জীবনের যে সব কথা আমি বলতে চাই না সেগুলো শুরু হল। সেগুলো যে খুব বিশ্রী তা নয়। বাড়িয়ে বলবার ইচ্ছে আমার নেই। অন্যদের চেয়ে এই অবস্থায় কষ্টও আমি বোধ হয় কম পেয়েছি। তবে একটা ব্যাপারে সেই গোড়ার দিকেই বিরক্ত লাগত। নিজেকে স্বাধীন ভাবার অভ্যাস থেকেই বাধত গোল। যেমন হঠাৎ কোনো সময়ে সমুদ্রে গিয়ে স্নান করবার প্রবল ইচ্ছা হত। পায়ের কাছে ঢেউয়ের সেই ছলাৎ ছল শব্দটা ভাবতেই, শরীরের ওপর জলের মোলায়েম স্পর্শ কল্পনা করতেই, আর তাতে যে অপূর্ব মুক্তির আস্বাদ তার কথা মনে

করতেই আমার কুঠুরির সঙ্কীর্ণতা অত্যন্ত নির্মমভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠত।

মনের এই অবস্থাটা কয়েক মাস মাত্র ছিল। এর পরের যা ভাবনা তা কয়েদীরই উপযোগী।

দৈনিক বেড়াবার সময়টুকুর জন্যে আমি তখন অপেক্ষা করতে শিখেছি, আমার উকিলের আসার সময় আমি গুনি। বাকি সময়টা সত্যিকথা বলতে গেলে আমি বেশ একরকম কাটাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। অনেকবার ভেবেছি যে আমায় যদি কোন মরা গাছের কোটরে থাকতে হত আর মাথার ওপরের আকাশের টুকরোটুকু চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো কাজ না থাকত তাহলেও ধীরে ধীরে আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে বোধ হয় পারতাম। তখনো পাখি উড়ে যাওয়া বা মেঘ ভেসে যাওয়ার আশায় বসে থাকতে আমি শিখতাম। এখন যেমন আমার উকিলের অদ্ভুত সব নেকটাই দেখবার জন্যে আমি তৈরী থাকি, বা আগেকার জীবনে রবিবারে মারীর সঙ্গে একটু প্রণয়লীলার জন্যে সারা হপ্তা যেমন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতাম সেই রকমই আর কি!

যাই হোক এখানে অন্তত মরা গাছের কোটরে থাকতে হচ্ছে না। দুনিয়ায় কত লোকের দিন আমার চেয়েও খারাপ কাটছে। মার একটা পুরানো কথা মনে পড়ল। প্রায়ই তিনি বলতেন শেষ পর্যন্ত সব কিছুই মানুষের সয়ে যায়।

সাধারণত কোনো কিছু অত তলিয়ে আমি ভাবতাম না। প্রথম কয়েকটা মাস অবশ্য বেশ কষ্ট হত। কিন্তু সে কষ্ট সইতে সইতেই তা কাটিয়ে উঠবার পথ পেলাম।

দৃষ্টান্ত হিসাবে নারী দেহের জন্যে আমার অদম্য কামনার কথা বলা যায়। আমার বয়সে সেটা স্বাভাবিক। আমি বিশেষভাবে শুধু মারীর কথাই ভাবতাম না। এ, ও, সে— নানা মেয়ের কথাই আমার তীব্রভাবে মনে হত। যার যার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, যে অবস্থায় যাকে ভালোবাসা নিবেদন করেছি সকলের কথাই এত বেশী করে ভাবতাম যে আমার কুঠুরিটা যেন সেই সব অতীত কামনার ছায়ামূর্তি, সেইসব চেনা মুখের ভিড়ে ভরে থাকত। আমি বিচলিত হতাম সন্দেহ নেই কিন্তু সময় কাটাবার সুবিধেও তাতে হত।

জেলের সর্দার প্রহরীর সঙ্গে ক্রমশ আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। খাবার সময় সে রান্নাঘরের অন্য যোগাড়দারের সঙ্গে সমস্ত কয়েদীদের খাবার দিয়ে যেত।

সে-ই একদিন মেয়েদের কথা তুললে।—কয়েদীরা ওই নিয়েই সবচেয়ে গজগজ করে, সে আমায় বললে।

বললাম যে আমারও তাদের মতো খারাপ লাগে।—এক হিসেবে এটা কিন্তু অন্যায়। *মরার ওপর খাঁড়ার ঘা গোছের!*

—কিন্তু আসল কথাটা তো তাই। সে বললে,—সেই জন্যেই তোমাদের জেলে রাখা হয়েছে।

—বুঝতে পারলাম না!

সে বললে,—স্বাধীনতা মানে যা, তা থেকে তোমাদের বঞ্চিত করবার জন্যেই জেলে রাখা।

ঠিক এই দিক থেকে কথাটা কখনও ভাবি নি। তার বক্তব্যটা কিন্তু বুঝলাম। বললাম, —*তা ঠিক। তা না হলে শাস্তি হবে কিসে?*

সিগারেটের অভাবও আর এক যন্ত্রণা! জেলে ঢোকবার পর আমার কোমরবন্ধ, জুতোর ফিতে, আর সিগারেট ইত্যাদি পকেটের সব কিছুই ওরা নিয়ে নিয়েছিল। একলা একটা কুঠুরি পাওয়ার পর আমি আর কিছু না হোক সিগারেটগুলো ফেরত চেয়েছিলাম। সিগারেট কয়েদীদের খেতে দেওয়া হয় না, তারা জানিয়েছিল। সব চেয়ে জব্দ ওতেই হয়েছিলাম।

প্রথম কদিন তো কষ্টের সীমা ছিল না। আমার খাটের তক্তা থেকে কাঠের চোকলা ভেঙে নিয়ে চুষতাম। সমস্ত দিন কেমন দুর্বল মনে হত নিজেকে। গা বমি বমি করত। কেন যে আমায় সিগারেট খেতে দেওয়া হবে না আমি বুঝতে পারি নি। তাতে কারুর তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

পরে উদ্দেশ্যটা বুঝেছিলাম। এটাও একটা শাস্তি। কিন্তু তখন সিগারেটের আগ্রহ আমার চলে গেছে সুতরাং শাস্তিটাও আর নেই।

এই সব অসুবিধাগুলো বাদ দিলে আমি যে খুব অসুখী ছিলাম তা বলতে পারি না। তবে আসল সমস্যা হল কি করে সময় কাটান যায়। একবার আগেকার কথা স্মরণ করবার কায়দাটা আয়ত্ত করবার পর কিন্তু সময় কাটাবার জন্যে আর আমায় ভাবতে হয়নি। কখনো আমি আমার শোবার ঘরটার কথা ভাবতাম। এক কোন থেকে শুরু করে পরপর সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি স্মরণ করবার চেষ্টা করতাম। প্রথম প্রথম দু এক মিনিটেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এই মনে করার খেলাটা আবার যতবার খেলেছি ততই সময় আরো বেশী লেগেছে। প্রত্যেকটি আসবাবপত্র স্পষ্টভাবে কল্পনা করবার চেষ্টা করতাম, যা যা তাতে আছে সব। তন্নতন্ন করে খুঁটিনাটির ও খুঁটিনাটি আমি স্মৃতি থেকে খুঁজে বার করতাম, যেমন কোথায় একটা সামান্য ঠোকার দাগ, কোথায় এতটুকু চোকলা ওঠার চিহ্ন, কাঠের নির্ভুল রঙ আর তার আসল চেহারা। সেই সঙ্গে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত তালিকাটা ঠিক পরপর আমি মনে রাখবার পণ করতাম।

তার ফলে কয়েক সপ্তাহ বাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি শুধু আমার শোবার ঘরের জিনিসপত্রের হিসেব করেই কাটিয়ে দিতে শিখলাম। তখনই দেখেছিলাম যে যত ভাবা যায় ততই ঝাপসা আধ-ভোলা সব খুঁটিনাটি স্মৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। এ ব্যাপারের আর শেষ যেন নেই।

এই থেকেই আমার মনে হয়েছিল যে বাইরের জগতের একদিনের অভিজ্ঞতা দিয়েই মানুষ একশ বছর কারাগারে কাটিয়ে দিতে পারে। এত স্মৃতির সঞ্চয় তার থাকে যে কখনো একঘেয়েমিতে হতাশ হবার তার কারণ নেই। একদিক দিয়ে এটা একটা ক্ষতিপূরণ বলা যায়।

তারপর ছিল আমার ঘুম।

গোড়ার দিকে রাত্রে আমার ভালো ঘুম হত না, দিনেও ঘুমোতে পারতাম না। ক্রমশ রাত্রে ভালোই ঘুম হতে লাগল দিনেও তন্দ্রার ঘোরে গড়াতে পারলাম। শেষ ক-মাস তো দিন রাতে ষোলো থেকে আঠার ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। বাকি থাকত মাত্র ছ ঘণ্টা—খাওয়া দাওয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি শারীরিক প্রয়োজন, স্মৃতি নিয়ে খেলা আর সেই 'চেক'-এর গল্প দিয়ে ভরিয়ে রাখবার চেষ্টা।

একদিন আমার খড়ের তোষকটা ওল্টাতে গিয়ে তার তলায় এক টুকরো খবরের কাগজ এঁটে আছে দেখলাম। কাগজটা এত পুরানো যে জিরজিরে হলদে হয়ে এসেছে। কিন্তু তবু তার লেখাগুলো কষ্ট করে পড়া যায়। সেখানে একটা অপরাধের কাহিনী ছাপা। প্রথম অংশটা নেই, কিন্তু বাকিটা পড়ে আমি বুঝলাম ব্যাপারটা চেকোশ্লোভাকিয়ার কোনো গ্রামে ঘটেছিল। গ্রামের একজন ভাগ্য পরীক্ষা করতে দেশ ছেড়ে চলে যায়। পঁচিশ বছর বাদে বড়লোক হয়ে সে তার স্ত্রী আর সন্তান নিয়ে গ্রামে ফেরে। ইতোমধ্যে তার মা ও বোন গ্রামে একটা হোটেল খুলে চালাচ্ছে। তাদের চমকে দেবার জন্যে সে অন্য এক সরাই-এ স্ত্রী

ও সন্তানকে রেখে একা ছদ্মনামে গিয়ে মার হোটেলে ঘর ভাড়া নেয়। তার মা ও বোন তাকে চিনতেই পারেনি। রাত্রে খাওয়ার সময় সে নিজের কাছে যে প্রচুর টাকা আছে তা তাদের দেখায়। সেই রাত্রেই মা আর বোন মুগুর মেরে তাকে হত্যা করে। টাকাগুলো নিয়ে তারা লাশটা নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। পরের দিন লোকটির স্ত্রী এসে সরল ভাবে স্বামীর পরিচয় জানায়। মা তারপর গলায় দড়ি দিয়ে মরে আর বোন কুয়ায় ঝাঁপ দেয়।

গল্পটা আমি কমপক্ষে হাজার বার পড়েছি। কিন্তু কেমন আজগুবিই মনে হয় : তবে এরকম ঘটনা অসম্ভবও নয়। যাই হোক লোকটা সেধেই নিজের সর্বনাশ ডেকেছিল। বোকার মত ওরকম চালাকি করার কোনো মানেই হয় না।

এইভাবে লম্বা ঘুম, স্মৃতির পরীক্ষা, সেই খবরের কাগজের টুকরো পড়া আর আলো অন্ধকারের পালায় আমার দিনগুলো বয়ে গেল। কোথায় যেন পড়েছিলাম যে জেলখানায় কারুর সময়ের হিসাব থাকে না। কিন্তু তা থেকে স্পষ্ট কিছু বুঝি নি। দিন যে অতি ছোট বা অত্যন্ত বড় কি করে হতে পারে, আমার ধারণায় আসে নি। কাটাবার পক্ষে দিন অতি দীর্ঘ অবশ্য হতে পারে, এত দীর্ঘ যে শেষ পর্যন্ত একটির সঙ্গে আর একটি মিশে যায়। ঠিক দিন বলে কিছুর হিসাব আমার ছিল না। গত আর আগামীকাল এই দুটো কথারই কিছু মানে শুধু পেতাম।

একদিন সকালে জেলার আমায় জানালে যে ছ মাস ধরে আমি জেলে আছি। তার কথা আমি বিশ্বাস করলাম কিন্তু মনে তাতে কোনো দাগ কাটল না। আমার মনে হল যেন সেই একই দিন আমার এই জেলের কুঠুরিতে আসার পর ঘুরে ঘুরে আসছে। যেন সেই একই কাজ আমি নিত্য করে চলেছি।

জেলার চলে যাবার পর আমার টিনের থালাটা ঘসে ঘসে চকচকে করে তাতে আমার মুখটা ভালো করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম। মনে হল আমায় অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছে হাসবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও। থালাটা নানাভাবে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে দেখলাম কিন্তু আমার মুখের সেই এক বিষণ্ণ গম্ভীর চেহারা।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। এই সময়টার কথা না বলাই ভালো। এ সময়টার আমি বলি নাম নেই। যেন চুপি চুপি সন্তর্পণে জেলখানার সব কটা তলা থেকে সন্ধ্যার সব শব্দ এই সময়ে সার বেঁধে আসতে থাকে।

গরাদ দেওয়া জানালাটার কাছে গিয়ে শেষ আলোয় আমার মুখটা আবার দেখলাম। সেই গাম্ভীর্য। তাতে অবাক হবার কিছু অবশ্য নেই। কারণ সত্যিই আমি তখন গম্ভীর হয়ে গেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটা শব্দ আমি শুনলাম বহুকাল যা শুনি নি। সেটা কণ্ঠস্বরের শব্দ—আমার নিজেরই কণ্ঠস্বর। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ আর নেই। আমি বুঝতে পারলাম এই শব্দই কিছু দিন থেকে প্রায়ই আমার কানে বাজছে। বুঝলাম যে আমি নিজের মনে বকি।

অনেককাল আগের শোনা একটা কথা এবার আমার মনে পড়ল—মার শেষকৃত্যের সময় নার্স যা বলেছিল।

না কোথাও কোনো পথ নেই আর কারাগারের সন্ধ্যা যে কি বস্তু কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র [ক্রমশঃ]

বঙ্গসংস্কৃতির প্রসার ও সামাজিক দূরত্ব

বিনয় ঘোষ

বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সংস্কৃতির যে রূপায়ণ হয়, তার একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব, প্রাধান্য ও প্রসার, মিলন মিশ্রণ ও সংঘাত, এবং গ্রহণ-বর্জন ও বিলোপের রীতির মধ্যেই সংস্কৃতির ইতিহাসের সমস্ত রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিস্ময় লুকিয়ে থাকে। বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণের কয়েকটি এই ধরনের রীতির এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার আমরা বিচার করব। কিন্তু তা করার আগে সংস্কৃতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা দরকার।

যে-কোন জাতির, যে-কোন দেশের বা অঞ্চলের সংস্কৃতিধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক উপাদানের স্থিতি (Persistence), সৃষ্টি (Invention) ও লয় (Loss) বলে অভিহিত করেছেন। অতীত কালের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আমরা বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল ধরে বহন করে চলি, সহজে ছাড়তে পারি না, এমনকি সজ্ঞানে চেষ্টা করেও তার প্রভাবমুক্ত হতে ব্যর্থ হই। মনের অবচেতন গুহায় সেগুলি লুকিয়ে থাকে, সুযোগ মতো বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের অভ্যাস আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ধ্যানধারণা, উৎসব-পার্বণ অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে দেখলে, অতীত সংস্কৃতির অনেক মৃত উপাদানের জীর্ণ কংকালের সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, মানুষের মানসলোক একটা প্রাচীন গোরস্থানের মতো, যেখানে অতীতকালের বহু মৃত ধ্যান-ধারণার ভূতপ্রেত যে-কোন সময় দৌরাত্ম্য করার জন্য যেন ওঁৎ পেতে রয়েছে। যেমন 'গুরুবাদ' বহুকালের অতীত সংস্কৃতির একটি উপাদান হলেও, আধুনিক কালে সাধু-পীরদের আস্তানা থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যন্ত তার প্রভাব যথেষ্ট আছে দেখা যায়। তাবিচ-কবচের আধিপত্য বিজ্ঞানের যুগে অবশ্যই কমেছে ও কমছে, কিন্তু আজও তা কেন একেবারে লোপ পায়নি ভাবলে অবাক হতে হয়,·বিশেষ করে শিক্ষিতদের মধ্যে। সংস্কৃতির এই দীর্ঘস্থিতির বৈশিষ্ট্যকে 'পার্সিস্টেন্স' বলা হয়।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, নূতনের উদ্ভাবন, আবিষ্কার বা সৃষ্টি। যুগে-যুগে সমাজের তাগিদে নূতন নূতন সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্ভাবিত হয়, এবং তার ঘাতপ্রতিঘাতে ধীরে ধীরে পুরাতনের ভাঙন ও নূতন ধারার গড়ন শুরু হয়। নূতন-পুরাতন উপাদানের মিলন-মিশ্রণের ভিতর দিয়ে নূতন নূতন 'কালচার-কমপ্লেক্সের' সৃষ্টি হয়। ক-খ-গ উপাদানের সংগে যখন নূতন ঘ-ঙ উপাদান মিশ্রিত হয়, তখন পূর্বের উপাদানের বিন্যাস বা সন্নিবেশ বদলে যায়, এবং তার ফলে উপাদানান্তর্গত এবং সন্নিবেশগত তাৎপর্যও রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতিকে এই কারণে configuration বলা হয়, এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভাবন ও বিলোপের ফলে এইজন্যই মৌল সংস্কৃতির তাৎপর্যান্তর ঘটে, কেবল একটা সমষ্টি থেকে দু'একটি উপকরণের যোগবিয়োগ হয় না। নূতন সামাজিক পরিবেশে পুরাতন সংস্কৃতির অনেক অনাবশ্যকীয় উপাদান লোপ পেয়ে যায়। এই লয়শীলতা সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় হল, সৃষ্টিশীলতা ও লয়শীলতা সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার পরিচায়ক, এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত শক্তি তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতার চেয়ে অনেক বেশী

প্রবল।

সাংস্কৃতিক স্থিতিরই একটা বড় দিক হল 'ট্র্যাডিশন' বা ঐতিহ্য। সাধারণত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের প্রবাহকে আশ্রয় করেই ঐতিহ্যের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতির কালিক প্রবাহ হল ঐতিহ্য। তা ছাড়া, সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহও আছে, যাকে 'ডিফিউসন' বলা হয়। সাংস্কৃতিক ট্র্যাডিশনের গতি কালিক বলে 'ভার্টিক্যাল', এবং 'ডিফিউসনের' গতি ভৌগোলিক বলে 'হরাইজণ্টাল'। সংস্কৃতির গভীরতা হল 'ট্র্যাডিশন', এবং প্রসারতা হল 'ডিফিউসন'। একটির গতি কাল থেকে কালান্তরের দিকে, অন্যটির গতি দেশ থেকে দেশান্তরের দিকে। বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত সংস্কৃতির যে প্রবাহ, তা হল 'ডিফিউসনের' বা প্রসারণের ব্যাপার। কিন্তু বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বণিক গোপ সদ্‌গোপ মাহিষ্য কৈবর্ত, অথবা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব কৌলিক ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারের অস্তিত্ব দেখা যায়, সেগুলিকে ঐতিহ্যগত সংস্কার বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা সেইজন্য সাংস্কৃতিক প্রসারণ বা diffusion কে বলেন 'inter-societal transmission of culture in space', এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা traditionকে বলেন, 'intra-societal transmission of culture in time'.

উদ্ভাবন যেমন সংস্কৃতির ধর্ম, প্রসারণ তেমনি সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। সামাজিক বা ঐতিহাসিক অবস্থান্তরের জন্য যখন নূতন কোন সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব হয়, তখন তার প্রসারের গতিপথ যদি কোন কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, অথবা সমান গতিতে সমাজের সর্বস্তরে না প্রসারিত হতে পারে, তাহলে সংকট দেখা দেয়। যদি ভৌগোলিক কারণে, সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানের জন্য, নব্যসংস্কৃতির প্রসারে বাধা সৃষ্টি হয়, এবং কেন্দ্রবহির্ভূত কোন অঞ্চলের সংস্কৃতি সেই কারণে অনুন্নত থাকে তাহলে তাকে বিজ্ঞানীরা 'মর্জিন্যাল কালচার' বা প্রান্তীয় সংস্কৃতি' বলেন :

"Cultures are retarded because of their peripheral or marginal position in geography". (Kroeber).

সংস্কৃতির ডিফিউসন বা প্রসারণের গতি হল, কেন্দ্র বা 'সেণ্টার' থেকে 'মার্জিন' বা প্রান্তের দিকে। কিন্তু এই গতির কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কেন্দ্র থেকে বাইরের প্রান্তের ব্যবধান যত বেশী হবে, সংস্কৃতির প্রসার হতেও যে তত বিলম্ব হবে, এমন কোন কথা নেই। সাধারণত তাই হবার কথা, কিন্তু তা নাও হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি অঞ্চল দূরের অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী অনগ্রসর। যেমন, কলকাতা শহরের সীমানা থেকে পাঁচ-সাত-দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত হাওড়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলার বহু গ্রামাঞ্চল বর্ধমান-মুর্শিদাবাদের তুলনায় অনেক বেশী অনুন্নত। তাছাড়া, কলকাতা শহরের মধ্যেই এমন অনেক পাড়া আছে যেখানে শহরের উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ পড়েনি দেখা যায়। কোন উন্নত সংস্কৃতিকেন্দ্রের সীমানার মধ্যে এই ধরনের কোন অনুন্নত অঞ্চল থাকলে তাকে 'ইণ্টার্নালি মার্জিন্যাল' বলা হয়। কারণ,

"Some cultures remain retardad even though they are situated within the sphere of higher productive centres, and therefore they are called *internally marginal.*"

সংস্কৃতির এই 'internal marginality' বা আন্তর্প্রান্তিকতা যানবাহন ও চলাচল-

ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য ঘটতে পারে, আবার সমাজের শ্রেণীগত পার্থক্য এবং জাতিবর্ণগত দূরত্বের জন্যও ঘটতে পারে।

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন, বাংলার সংস্কৃতির এই প্রান্তীয়তার বা মার্জিন্যালিটির সমস্যা খুব বড় সমস্যা। বাইরের ও ভিতরের, দুই ধরনের প্রান্তীয়তাই বাংলার সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব (Spatial isolation and distance) এবং ভিতরের প্রান্তীয়তার কারণ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান (Social isolation and distance)। এই দুই শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান দূর করতে না পারলে, বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক স্তরে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না, এবং তা না প্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয় উন্নয়নের কাজকর্ম পদে-পদে ব্যাহত হবে।

কমবেশী সব যুগেই দেখা যায়, যুগসংস্কৃতির কতকগুলি বড় বড় কেন্দ্র থাকে। মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহদের দরবার ও শাসনকেন্দ্রই ছিল প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র। বাংলাদেশে যেমন ছিল গৌড়, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি। তার বাইরে ছিল চিরপ্রবহমান গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা। দরবারী সংস্কৃতি বা 'কোর্ট-কালচার' এবং এই গ্রামীণ সংস্কৃতি, যা প্রধানতঃ 'ফোক-কালচার', দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হত। রাজদরবার বা রাজধানী থেকে বাইরে গ্রামাঞ্চলের দিকে কোর্ট-কালচার যে কদাচ বিচ্ছুরিত হ'ত না তা নয়। হ'ত বটে, কিন্তু সেই বিচ্ছুরণ প্রায় দৈবঘটনার সামিল ছিল বলা যায়। তার কারণ, একালের মতো সেকালে যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার আদৌ কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এই যোগাযোগের অভাবজনিত বিচ্ছিন্নতার জন্যই বাংলার গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বনির্ভরতা। আধুনিক কালেও দেখা যায়, সেই রাজধানীই যুগসংস্কৃতির প্রধানকেন্দ্র বা হেডকোয়ার্টার হয়ে রয়েছে, তবে যানবাহনের ও যোগাযোগের প্রসারের ফলে আরও অনেক সাংস্কৃতিক উপকেন্দ্র গড়ে উঠেছে বাইরে। এই সব উপকেন্দ্র থেকে সংস্কৃতিধারা শাখাপ্রশাখা মেলে ক্রমে পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এবং গত প্রায় একশ বছরের উপর রেলগাড়ী ও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর অটোমোবাইলের চলাচলের পরেও, পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তীয় সংস্কৃতি-অঞ্চল এত বেশী সংখ্যায় আজও রয়েছে, যা বাস্তবিকই ভয়াবহ বলে মনে হয়। কলকাতা শহর থেকে পঁচিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এখনও এমন সব গ্রাম আছে যেখানে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন চিঠি বিলি হয়, এবং ডুলিতে করে লোকে চলাফেরা করে। হাওড়া জেলাতেই এরকম বহু গ্রাম আজও রয়েছে। এই সব গ্রামের অতিবৃদ্ধদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে মনে হয় যেন সভ্যতার আদিকালের কোন প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। কলকাতা বা হাওড়া শহর কেন্দ্র করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল 'রেডিয়াস' নিয়ে যদি একটা বৃত্ত টানা যায়, তাহলে বড় বড় কয়েকটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের মধ্যে এই ধরনের কয়েকটি প্রান্তীয় অঞ্চল দেখা যাবে। এগুলি অবশ্য ভৌগোলিক প্রান্তীয়তার নিদর্শন। অটোমোবাইলের যুগে এই প্রান্তীয়তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হবার কথা, কিন্তু বাংলার গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অচলতা আজও অটোর স্বতঃস্ফূর্ত গতি একেবারে ভাঙতে পারেনি। তা ভাঙতে না পারলে, এবং গ্রাম শহর-নগরের মতো সচল ও গতিশীল না হলে, জাতির সংস্কৃতি কখনও জনসাধারণের সম্পদ হবে না, মুষ্টিমেয়র ভোগবিলাসের সামগ্রী হয়ে থাকবে। তার চেয়েও ক্ষতিকর ফল হবে এই (এবং যা অধিকাংশ প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলে হয়েছে দেখা যায়) যে, নগর-শহরের পাঁচমিশালি সংস্কৃতির তলানিটুকু চুঁইয়ে এসে প্রান্তীয় অঞ্চলের জড়ত্বকে আরও

বেশী বিষিয়ে তুলবে। নাগরিক সংস্কৃতির ভালটুকুর বদলে মন্দটুকুই তার ভাগ্যে জুটবে, এবং সেই মন্দের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে উঠবে তার জড়জীবন। বাংলাদেশের প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই একথা উপলব্ধি করতে পারবেন।

উন্নত সংস্কৃতিকেন্দ্রের বাইরের এই ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা ছাড়াও বাংলার সংস্কৃতির ভিতরের প্রান্তীয়তা কম নেই। বাইরের তুলনায় ভিতরের এই ব্যবধান আরও অনেকগুণ বেশী ভয়াবহ। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক দূরত্ব, কিন্তু কোন সংস্কৃতিবৃত্তের ভিতরের প্রান্তীয়তার প্রধান কারণ 'সামাজিক দূরত্ব' (Social distance)। ভৌগোলিক দূরত্ব যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে অপসারিত করা সম্ভব ও সহজ, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব সহজে দূর করা যায় না। একথা অবশ্য ঠিক যে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে গেলে এবং সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণের বা 'হরাইজণ্টাল ডিফিউসনের' গতি বাড়লে, বিভিন্ন লোকস্তরের সামাজিক দূরত্বও ধীরে ধীরে কমতে থাকে, কিন্তু সেই কমা না-কমার ব্যাপার অনেকাংশে নির্ভর করে দূরত্বের ধরনের উপর। বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেন যে সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণ তার ঊর্ধ্বাধ বা 'ভার্টিক্যাল' গভীরতাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে বিলম্বিত তালে করে, কারণ সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিবর্ণবিন্যাসের উপর সংস্কৃতির ঊর্ধ্বাধ প্রসারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। নূতন সংস্কৃতির ঐহিক ও মানসিক উপাদান যখন কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে প্রসারিত হতে থাকে, তখন সেই যুগের সমাজের সচেতন উপরের জনস্তরের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে, তার নিচে খুব বেশী গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এইজন্যই দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে সমাজের মুষ্টিমেয় লোকই 'সমসাময়িক' সংস্কৃতির ধারক ও বাহক :

The fact is that only a handful of people in any age are its true contemporaries. Only sluggishly do the mass of people respond to the currents that are sweeping through the ruling classes or the intellectual elite; if this is mainly true even today, it was more so before universal literacy had quickened the space of communication. (Lewis Mumford).

প্রত্যেক যুগে মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর লোকই তাঁদের কালের গতিশীল সংস্কৃতির মুখপাত্র হন, এবং তাঁদেরই কেবল সেই যুগের বিচারে 'সমসাময়িক' বলা যায়। নূতন যুগের আবির্ভাবকালে সংস্কৃতিকর্মের বেশীর ভাগ উদ্যম তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তার শতাংশের একাংশও বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। তার কারণ সংস্কৃতির বাহনগুলির বিকাশ আগের যুগে তো হয়ই নি, আধুনিক জনশিক্ষার যুগেও তার বিকাশ নানাকারণে ব্যাহত হয়েছে। যুগে যুগে যুগসংস্কৃতির মুষ্টিমেয় প্রবর্তকশ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর লোকসমাজের ব্যবধান তাই ক্রমে দুস্তর হয়েছে। প্রাচীন যুগের চেয়ে মধ্যযুগে ব্যবধান বেড়েছে, এবং তার চেয়ে আরও অনেক বেশী বেড়েছে আধুনিক যুগে। তার কারণ, সংস্কৃতির অগ্রগতির বেগ যত বেড়েছে, সমাজের শ্রেণীগত দূরত্ব ও জাতিবর্ণগত দূরত্বের সেই অনুপাতে অবসান হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসার যত বেড়েছে, সামাজিক গভীরতা সেই অনুপাতে বাড়েনি। ভাবগত ও বাস্তব উপাদানগত সংস্কৃতিসম্পদ থেকে বৃহত্তর জনসমাজ তাই ক্রমেই বঞ্চিত হয়েছে।

বাংলার সমাজে আধুনিক যুগসংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসারও ব্রিটিশ আমলে ব্যাহত হয়েছে, তার কারণ, স্বাভাবিক গতিতে সংস্কৃতির টেক্‌নোলজিক্যাল উপাদানের বিকাশের পথে (যেমন যানবাহন, কলকারখানা, শহর-নগর ইত্যাদি) তাঁরা নানারকমের অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। তার ফলে বাংলার গ্রাম্যসমাজের সঙ্গে একালের নাগরিকসমাজের ব্যবধান ক্রমে বেড়েছে, এবং বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির আঞ্চলিক বৃত্তগুলি যুগসংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে বিকৃতি অবনতি, এবং অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে। 'ট্রাইবাল' যুগ থেকে মধ্যযুগের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আধুনিক যুগের গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যেও স্বচ্ছন্দে মিলেমিশে রয়েছে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক যুগের অন্যতম সাংস্কৃতিক লক্ষণ হল, মনের বিকেন্দ্রণ (de-localisation of mind)। আধুনিক লোক-মানসের বিকাশের স্বাভাবিক গতি এই বিকেন্দ্রণের দিকে, কিন্তু এর কোনও চিহ্ন বাংলার গ্রাম্যসমাজে আজও বিশেষ দেখা যায় না।

বাংলার সমাজে (এবং ভারতীয় সমাজেও) সংস্কৃতির 'ভার্টিক্যাল' প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক বৈষম্য। এই বৈষম্যই আমাদের দেশে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ বললে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক যুগের শ্রেণীগত দূরত্বের সঙ্গে এই জাতিবর্ণগত দূরত্ব মিলিত হয়ে এমন একটি কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যা পাশ্চাত্ত্য বা অন্য কোন সমাজে বিরল বলা চলে। সংস্কৃতির 'ভার্টিক্যাল' প্রসারের পথে এই প্রবল অন্তরায় যতদিন না অপসারিত করা সম্ভব হবে, ততদিন কেবল সংস্কৃতির 'হরাইজণ্টাল' প্রসারে সমস্যার সমাধান হবে না। বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণে জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়ের এই সামাজিক দূরত্বই সবচেয়ে শক্তিশালী ঐতিহাসিক কারণরূপে কাজ করেছে। মানসিক বিকেন্দ্রণের মতো, বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতি হল সামাজিক দূরত্বলোপের দিকে (Social de-distantiation).। সংস্কৃতিবিচারের দিক থেকে এই সামাজিক স্তরীয় দূরত্বের গুরুত্ব কতখানি সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর মত হল :

Another important example of social distance is the vertical distance between hierarchical unequals............ This is reflected in an enormous number of behaviour patterns developed by hierarchically stratified societies............... In the sociology of culture the problem of vertical distance and distantiation is, of course, paramount. It is important to see that vertical distantiation may concern, not only the mutual relationship of two groups, but also the relationship between a person or group and inanimate objects of cultural significance. (Karl Mannheim).

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-উপজাতির সামাজিক স্তরবিন্যাস এত দৃঢ় ও গভীর যে সেখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা কোন নিটোল রূপ সহজে নজরে পড়ে না। তার মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী ধারা-উপধারা ও উপাদান মিশ্রিত হয়েছে। জাতিবর্ণ-ভেদে একই উৎসবের ও একই বস্তুর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের তারতম্য আছে দেখা যায়। আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার পার্থক্য তো আছেই। গ্রামীণ সংস্কৃতি বলতে কতকগুলি বাঁধাধরা বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বোঝায়, এরকম একটা কেতাবী ধারণা আমাদের অনেকের মনে আছে। কিন্তু সরজমিনে যাঁরা সেই সংস্কৃতির বিচারবিশ্লেষণে অগ্রসর হবেন, তাঁরাই তার

জটিলতায় ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত হবেন। এই জটিলতা ও বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ হল, গ্রাম্য-সমাজের জাতিবর্ণগত স্তরবিন্যাস এবং বিভিন্ন জনস্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক শ্রেণীদূরত্বকেও এই সামাজিক দূরত্ব ছাড়িয়ে গেছে। এমন অনেক গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আজও আছে যেখানকার বসতিবিন্যাসের মধ্যে বর্ণপ্রাধান্য স্পষ্টরূপে দেখা যায়, কিন্তু শ্রেণীপ্রাধান্য (যা শহরে দেখা যায়) বিশেষ দেখা যায় না। অন্তত শহরের মতো বসতিবিন্যাসের মধ্যে তা প্রতিফলিত নয়। একই বর্ণের ও জাতি-উপজাতির ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্রের বাস এক-অঞ্চলে। পরিষ্কার বোঝা যায়, জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের (হিন্দু-মুসলমান) সামাজিক দূরত্ব আধুনিক শ্রেণীদূরত্বের চেয়ে অনেক বেশী দুস্তর। এই সামাজিক দূরত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবার ফলে বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে একটা দুস্তর মানসিক দূরত্বও রচিত হয়েছে। গ্রাম্য উৎসব-পার্বণের বাইরের মেলামেশায়, অথবা গ্রাম্য জীবনের সরল প্রীতির সম্পর্কের আবরণে অনেক সময় এই সামাজিক দূরত্ব ঢাকা থাকে। কিন্তু হাজার মেলামেশাতেও যে গ্রামের বিভিন্ন জনস্তরের মানসিক দূরত্ব ঘুচে যায়নি, তা যে কেউ গ্রামের মধ্যে পা দিলেই বুঝতে পারবেন। বৈজ্ঞানিক অর্থে এই সামাজিক দূরত্বকে 'মানসিক ব্যবধান' বললেও ভুল হয় না। একজন বিখ্যাত মানস-বিজ্ঞানী সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই 'সামাজিক দূরত্বের' প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি জাহাজ ক্রমে বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। বন্দরের শহরটিও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এমন সময় গভীর কুয়াশায় ঢেকে গেল চারিদিক। মনে হল, শহরটা যেন ঝাপ্সা হয়ে অনেক দূরে সরে গেল। একেই বলে 'ডিস্ট্যাণ্টিয়েশন' :

This is 'distantiation', for the town remains spatially near; it becomes more distant only in a psychological sense. (E. Bullough).

কুলগত বর্ণগত জাতিগত ও সম্প্রদায়গত অজস্র সংস্কারের কুয়াশা বিভিন্ন জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়কে পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। একই গ্রামে বা একই অঞ্চলে অনেক কাছাকাছি বংশানুক্রমে বাস করেও মনের দিক থেকে তারা পরস্পরকে কাছে টানতে পারেনি। বাংলার গ্রাম্যসমাজের ও গ্রামীণ সংস্কৃতির (এবং সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজেরও) এটা একটা কঠিন জটিল সমস্যা। স্থানিক দূরত্ব না থাকলেও যে এই মানসিক দূরত্ব সহজে ঘুচবে, তা মনে হয় না। তা যদি ঘুচত, তাহলে একই গ্রামে ও অঞ্চলে উন্নত জাতি-বর্ণের পাশাপাশি অসংখ্য অনুন্নত উপজাতি-বর্ণের অস্তিত্ব থাকত না।

এখানে সংস্কৃতিবিজ্ঞানের দিক থেকে একটি বড় প্রশ্ন অনেকের মনে জাগবে। প্রশ্নটি হল : সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার হলেই কি তার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর? এই প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হল : সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে ঊর্ধ্বাধ প্রসারের সম্পর্ক কি? সংস্কৃতিবিজ্ঞানে 'ডিফিউসনের' প্রত্যয়টি অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উপাদানের ভৌগোলিক বিস্তরণই 'ডিফিউসন'। যান্ত্রিক যানবাহনের উন্নতি ও বিজ্ঞানের প্রগতির উপর এই ভৌগোলিক বিস্তার নির্ভরশীল। সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ও দূর প্রান্তে সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্রমবিস্তার হতে পারে, কিন্তু যে-সমাজের 'ভার্টিক্যাল মোবিলিটি' কম এবং স্তরীয় দূরত্ব খুব বেশী, সেই সমাজে তার দূরপ্রসারী কোন প্রতিক্রিয়া না হবার সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং কেবল যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে সাংস্কৃতিক উপকরণ জনসমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলে চলবে না। তার ফলে সমাজের ঊর্ধ্বাধ গতি খানিকটা বাড়বে ঠিকই, কিন্তু এতটা বাড়বে না যাতে দীর্ঘকালস্থায়ী

সামাজিক দূরত্ব ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানসিক ব্যবধানের অবসান ঘটতে পারে। সেই ব্যবধান দূর করতে হলে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন। যান্ত্রিক যানবাহনের সঙ্গে যদি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানেরও বিস্তার হতে থাকে, যদি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানাদর্শের আলোক শহর-নগরের মূলকেন্দ্র থেকে সুদূর প্রান্তবর্তী গ্রামের সর্বনিম্ন জনস্তর পর্যন্ত পৌঁছয়, তাহলে সংস্কৃতির অনুভূমিক গতির সঙ্গে ঊর্ধ্বাধ গতিও বাড়তে পারে এবং তার সামগ্রিক সুসমঞ্জস রূপায়ণও সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সংস্কৃতির রূপায়ণে ভৌগোলিক প্রসার এবং সামাজিক ও মানসিক দূরত্বের সমস্যা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক রূপায়ণের আরও একটি উল্লেখনীয় দিক আছে, যা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। সেই দিকটা হল, দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি-ধারার বাহক দুটি বা ততোধিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য বা কাছাকাছি বসবাসের ফলে, দুই সংস্কৃতির ঘাতপ্রতিঘাতের ও মিলনমিশ্রণের দিক। দুই সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত এই মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয়কে বিজ্ঞানীরা বলেন 'অ্যাকালচারেশন' :

We mean by acculturation the processes whereby societies of different cultures are modified through fairly close and long-continued contact, but without a complete blending of the two cultures. (Gillin and Gillin: *Cultural Sociology*).

'অ্যাকালচারেশনের' সঙ্গে 'ডিফিউসনের' সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শ আবশ্যক। কিন্তু 'ডিফিউসনের' জন্য সান্নিধ্যের বা পাশাপাশি অবস্থানের প্রয়োজন নাও হতে পারে। একটা নূতন আইডিয়া বা আদর্শ, অথবা সংস্কৃতির কোন নূতন টেকনোলজিক্যাল উপাদান এক কেন্দ্র থেকে বহুদূর কেন্দ্রান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনের' জন্য ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃতি-মিশ্রণ ও সমন্বয় তিন রকমে হতে পারে : ১। দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, এবং তার ফলে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হতে পারে; ২। ভিন্‌দেশাগত লোকেরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য ঘটাতে পারে; ৩। বিদেশীরা দেশ জয় করে বিজিতদের উপর তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতেও পারে। সাধারণতঃ এই তিন উপায়ে ভিন্ন সংস্কৃতির সান্নিধ্য ও মিলন-মিশ্রণ ঘটা সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সাংস্কৃতিক রূপায়ণের ইতিহাসে এই মিলন-মিশ্রণের বা 'অ্যাকালচারেশনের' গুরুত্ব খুব বেশী। ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসেও এর গুরুত্ব কম নয়। প্রাগিতিহাসের দিগন্তরেখা পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত। পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ডাচ-ফরাসী-ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্য, সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে বাংলাদেশে। তা ছাড়া, নানা উপজাতির ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শের নিদর্শনও বাংলার সংস্কৃতিতে কম নেই। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংঘাতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল বাঙালী খ্রীস্টানরা। বাঙালী মুসলমানদের সাধারণ জনস্তরে সাংস্কৃতিক মিশ্রণের নিদর্শন

পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতির লোকায়ত স্তরে ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট আছে দেখা যায়। বাংলার বহু লোকদেবতা ও পীরগাজী এই 'অ্যাকাল-চারেশনের' সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিরূপে গ্রামে গ্রামে বিরাজ করছেন। বাংলাদেশের সাঁওতাল, মুণ্ডা, বাউরী প্রভৃতি অনেক উপজাতির সংস্কৃতির মধ্যে উন্নত হিন্দু-সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। এমনকি বৈষ্ণব-শাক্ত, শৈব-তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্মপন্থীরা এক-একটি অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। সাংস্কৃতিক লেনদেন খুব বেশী পরিমাণে বাংলাদেশে হয়েছে বলে এখানে জাতিবর্ণগত সামাজিক দূরত্ব সাধারণ মানুষকে তেমন অনুদার ও সংকীর্ণচিত্ত করতে পারেনি। সামাজিক দূরত্বের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন জাতিবর্ণের মানসিক প্রসার অনেকটা রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনের' বৈচিত্র্য সেই দূরত্বাবসানে বা 'সোশ্যাল ডি-ডিস্ট্যান্টিয়েশনে' বেশ খানিকটা সাহায্যও করেছে। 'অ্যাকালচারেশনের' ধর্মই তাই। যে-কোন দেশের সাংস্কৃতিক 'প্যাটার্ন' ও 'কম্প্লেক্সের' উপর যদি ঘন ঘন ভিন্ন সংস্কৃতির তরঙ্গাঘাত হতে থাকে, তাহলে সে-দেশের সংস্কৃতি সহজে জড়ত্বলাভ করতে পারে না। বাংলার সংস্কৃতি এই কারণে, জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক দূরত্ব ও মানসিক ব্যবধানের মধ্যেও, দীর্ঘকাল ধরে তার সজীবতা কিছুটা বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু এই সজীবতা চিরস্থায়ী নয়। সামাজিক দূরত্ব অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত না হলে, তার দেনা চক্রবৃদ্ধি-হারে তাকে শুধতে হবে। অতীতের লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, অথবা সমাজের উচ্চশ্রেণীর উন্নতি-প্রগতির আওয়াজ, কোন কিছুতেই তার অনিবার্য স্থবিরত্ব রোধ করা সম্ভব হবে না। কেবল ফাঁকা আওয়াজ এবং তার সঙ্গে দিকভ্রান্ত ব্যর্থ প্রয়াসই সার হবে। দিনে দিনে সংস্কৃতির মধ্যে নানারকমের অসঙ্গতি, বিরোধ ও বিশ্রী বিকৃতি দেখা দেবে, যা বর্তমানে কিছু কিছু দেখা দিচ্ছে, এবং সমাজ-শরীরের সর্বত্র তার বিষাক্ত প্রক্রিয়াও শুরু হবে। সমাজকল্যাণের জন্য তাই বাংলার যুগসংস্কৃতির অনুভূমিক ও ঊর্ধ্বাধ প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য, এবং সেই প্রসারের পথে ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্বের সমস্ত অন্তরায় দূর করা আবশ্যক। তা না হলে অনিবার্য সংস্কৃতিসংকট সমগ্র বাংলার সমাজকে এক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, যা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না।'

আধুনিক সাহিত্য

ইংরেজরা এদেশে আসার অনেক পরে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টিলগ্ন। তাদের মাধ্যমে যে সমস্ত য়ুরোপীয় ভাবধারা বাংলাদেশে এল তার প্রাথমিক ক্ষেত্রফল হ'ল কর্মান্দোলন। কিন্তু চিন্তা, মনন এবং শিল্পসৃজনে য়ুরোপীয় জীবনস্পর্শ রূপায়িত হ'তে প্রায় অর্ধশতাব্দী লেগেছে। মাইকেল এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই দুজনই ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নায়ক। সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে জীবনস্পর্শের নামান্তর সমাজ-সচেতনা। ব্যক্তির জীবনাচরণ ও ধ্যানে সমাজের গাঢ়স্পর্শ—চিরকালের ভাল উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে সর্বপ্রথম সমাজসমস্যাকে তুলে ধরলেন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক, সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণবাদের সঙ্গে ব্যক্তির আদিমপ্রবৃত্তির বিরোধ, আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষার মত স্বদেশরক্ষারও অনিবার্য ঔচিত্য—এই সমস্তই তাঁর উপন্যাসে উপস্থিত।

উপন্যাস সমাজের দর্পণ। ঔপন্যাসিকদের মৌল অন্বিষ্ট সমাজপরিক্রমা। তাই ডিকেন্স থেকে আলবেয়ার কাম্যু পর্যন্ত অনেকের উপন্যাসেই সমাজচিহ্ন লক্ষ্য করি। সে চিহ্ন কখনও শাশ্বতবেদনায় উত্তাল, তমস্বিনী হতাশায় শোকমন্থর, প্রকৃতির মত সজীব বা বিচিত্র চরিত্ররসে উদ্বেল। এইসব উপন্যাসে লেখকের লিখনভঙ্গী ও দর্শন শুধু নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার প্রসার এবং পুরোপুরি একটা দেশ বা জাতির জল-মাটি-জীবনের প্রগাঢ় সংহতি আমরা খুঁজে পাই।

কিন্তু এই ধারারই সমান্তরালে উপন্যাসশিল্পে আরেকটি ধারা প্রবাহিত। তা হ'ল সমাজচেতনাকে অস্বীকার করে বা সমাজআলিঙ্গনে ক্লান্ত হয়েই যেন লেখক তাঁর কল্পিত স্বপ্নের কাহিনী লেখেন। এই রোমাণ্টিক স্বপ্নকল্পনায় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট চরিত্র তাদের প্রায়মন্থর নিরুদ্বেগ জীবনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের তত্ত্বপ্রচারের সহায়ক হয়। সে তত্ত্ব খণ্ডিত এবং সম্ভবত ভ্রান্ত, কেননা সমাজের ব্যাপক পরিধিতে ঐসব চরিত্রের দেখা মেলে না। অবশ্য ঠিক মন-গড়া নয়, তবে জীবনের উত্তাপহীন নিশ্চয়ই এই সব চরিত্র। ঔপন্যাসিকের সমাজসচেতনার অগভীরতার প্রমাণ এই সব উপন্যাস। যেদেশে সমাজসমস্যামূলক উপন্যাসের তুলনায় রোমাণ্টিক উপন্যাসের সংখ্যাধিক্য ঘটে সেদেশে উপন্যাসশিল্পের ভবিষ্যৎ দ্বিধাগ্রস্ত।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে এই লক্ষণ প্রবল। অবশ্য বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায়, সমাজসচেতনা ও রোমাণ্টিসিজম্ এক এক কালে প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সমাজসমস্যার পাশাপাশি ঐতিহাসিক পটভূমিতে রোমান্সের স্বপ্ন বুনেছেন। তবে এক এক সময় এই দুটি ধারার কোন একটি যেন প্রাধান্য পায়। শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ সমাজপ্রাসঙ্গিক উপন্যাস বাংলাদেশের একটি সময়ের স্মৃতিচিহ্ন। তারপরই ভারতী-গোষ্ঠীর অনুশীলনে পুরোপুরি রোমাণ্টিক-প্রবণতা। ত্রিশের যুগের নবীন ঔপন্যাসিকরা একই সঙ্গে জীবনের কঠিন সংগ্রাম ও কল্পনার ফানুস উড়িয়েছেন। একদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আরেকদিকে প্রবোধ সান্যাল ও অচিন্ত্যকুমার। দ্বিতীয়োক্তরা উচ্ছ্বসিত বর্ণনায়, বর্ণাঢ্য ভাষায় জীবনের সুন্দর প্রেমাচ্ছন্ন পরিবেশ এঁকেছেন। কিন্তু,

নিশ্চয়ই সে প্রয়াস উপন্যাসে অসম্পূর্ণ এবং সে প্রয়াসে কবিতার উজ্জ্বলকোমল শান্ততা বেশি।

অথচ এর পাশাপাশি একটি দিক উপেক্ষিত হচ্ছে। লেখকের অন্তর্মনের নিখুঁৎ বিশ্লেষণ, চরিত্রের অন্তর্মুখিনতা, অনেক চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের বিদ্যুৎস্ফুরণের চেয়ে একটি কি দুটি চরিত্রের প্রায় শান্ত কিন্তু ঋজুব্যক্তিত্ব ও তত্ত্বদর্শিতাও উপন্যাসের অবলম্বন হ'তে পারে। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে। অন্যতর প্রমাণ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলি। জেমস জয়সের মত শুধু অন্তঃস্রোতের বর্ণনা নয়, আলবেয়ার কাম্যুর মত শুধু আত্মবেদনার বিস্তার নয়, বরং ব্যক্তির চোখে দেখা সমাজের চিহ্ন—এই সব উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু বাংলা উপন্যাস, ভয় হয়, সে পথ অবলম্বন করেনি। বিমল মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষের রচনায় হয় নিছক গালগল্প, ক্ষীণ-সমাজচিহ্ন অথবা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও মনোবিকারের হাহাকার।

তাই আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "রূপসী রাত্রির"* পর্যালোচনার সূচনায় আমাদের মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

উপন্যাসের শুরুতে দেখি সুপ্রভাতকে। মাংস-ঝলসানো দুপুরে তার আকণ্ঠ তৃষ্ণা, অথচ জলাঙ্গী নদীতে জলের ছিটেফোঁটাও নেই। না থাক, ক্ষতি কি—নদীর গা-ঘেঁষা বাড়ির মেয়ের কালো চোখে মেঘের মমতা থাকলেই হোল। 'ঘরের মধ্যে সোহিনী, তার শিয়রের জানালার কাছে গাছ আর গাছের পরেই নদী—আর সমস্ত কিছু আস্বাদ করবার মত একটি মন।' ভাবতেই সুপ্রভাতের কাছে আকাশের সমস্ত আগুন যেন তুষার হয়ে গেল। আর সোহিনী? তাকে চিনতেও পাঠকের দেরি হয় না। কানের কাছে মুখ এনে স্বর গাঢ় করে একদিন সে সুপ্রভাতকে বলেছে—'বলি, চাকুরী জোটাতে পেরেছ?' প্রশ্নটা শুধু সুপ্রভাতের মুখের ওপর প্রহার করেনি, মনের ওপরও করেছিল নিশ্চয়। তা না হলে সাড়ে তিন শ টাকার মাইনের চাকুরীর চিঠি হাতে নিয়ে 'গরমে-ধুলোয় একেবারে হাক্লান্ত' হয়ে সোহিনীর সন্ধানে সে জলাঙ্গীর তীরে ছুটত না। প্রেমিকের চাকুরী ত হোল, কিন্তু সোহিনীর দ্বিতীয় দাবি, একটা বাড়ি—অন্ততঃ ফ্ল্যাট। তা যেদিন হোল, সেদিন সুপ্রভাতের আঁচলে আঁচল দিয়ে কলকাতার ফ্ল্যাটে উঠে এল সোহিনী। বাঙলার সুসন্তান সুপ্রভাত, তার প্রেমের কাহিনী ইতিহাসে লিখে রাখার মত—'প্রথমে বললে, পড়া শেষ করো। করলুম। বললে শুধু পাস করলেই চলবে না। উচ্চ চূড়ায় জ্বলতে হবে। তাই হলুম, নিলুম ফার্স্ট ক্লাস। বললে, চাকুরী জোগাড় করো, করলুম, বেশ মোটা-সোটা থাকিয়ে চাকুরি। সব বাধা সরালুম একে একে। বাঙলার সুসন্তান এর বেশি আর কি করতে পারে?'

আর আছে পরমার কাহিনী।

বিধাতা এসে বললেন, পরমা, যা তোমার অভিলাষ বর নাও।

পরমা উল্লসিত হয়ে উঠল : দেবে? তুমি এত কৃপণ, তুমি দেবে হাত-ভরে?

বুক ভরে দেব। কিন্তু সাবধান, একটি মাত্র বরের বেশি পারবে না চাইতে। জীবনে যা তোমার শ্রেষ্ঠ অভিলাষ তাই একবার চেয়ে নাও।

তবে আমি কি করি?

যা তোমার উপস্থিততম তাই নাও। মুহূর্তের সূক্ষ্মতীক্ষ্ম চূড়ায় যে দুলছে তাকে।

তাকে?

হ্যাঁ উপস্থিততমই পরিপূর্ণতম।

পরমার এই পরিপূর্ণতম হচ্ছেন অধ্যাপক নলিনেশ। তাকে পাওয়ার জন্য পরমার ক্ষুধা আছে, কিন্তু সে 'ক্ষুধা খাদ্যের নয়, অমৃতের, দেহের নয়, প্রাণস্পর্শের।' সুতরাং দেখে শুনে মনে হয়, এ যেন পরমপুরুষের জন্য পরমা-প্রকৃতির অমৃত-কামনা। তারপর রাত্রির গহন অন্ধকারে অভিসার, কলকাতায় পলায়ন, থানা-পুলিশ, কোর্ট-হাকিম, উকিল-মোক্তার ইত্যাদির সহস্র বাধা। তবু সেই অমৃত-কামনা মিলনে সার্থক হোল—নলিনেশকে বিয়ে করে পরমা সোহিনীদের বাড়ির নীচের তলার ফ্ল্যাটে এসে উঠল।

উপন্যাসের তৃতীয় কাহিনীটি হোল গীতালি বোসকে নিয়ে। বিবাহিতা না হয়েও সে মা। কিন্তু তার জীবনের দুষ্ট গ্রহ অরবিন্দ দাসকে সে বিয়ে করতে রাজী হোল না। 'যেখানে ভালবাসা থাকে সেখানে সব দেওয়া যায়, সব নেওয়া যায়। আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে প্রবেশ করা যায় আগুনে। কিন্তু যেখানে এক বিন্দু স্নেহ নেই বিবেক নেই হিতবুদ্ধি নেই, যেখানে শুধু প্রতারণা অশ্রদ্ধা অপমান সেখানে পারব না সাড়া দিতে।' তাই এক নার্সের কাছে ছেলেকে রেখে গীতালি বাসুদেব ব্যানার্জীর বাহুলগ্না হয়ে উঠল গিয়ে সোহিনীদের কলকাতার পাড়ায়। গীতালি ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করেনি বাসুদেবের সমুদ্রে— 'হ্যাঁ, সমুদ্রে, যে সমুদ্র প্রত্যাখ্যান করে না, মাঝে মাঝে আশ্রয়ও দেয় সেই সমুদ্রে। জলের সমুদ্রে নয় ভালবাসার সমুদ্রে।'

কিন্তু এ-পর্যন্ত তিনজন প্রেমিকাই, অচিন্ত্যকুমারের মতে, ক্ষণিকা। অথচ স্রষ্টার ইচ্ছায় তাদের শাশ্বতী হতে হবে। তাই তাদের অগ্নি-পরীক্ষার ব্যবস্থা হোল। এল কলকাতার মর্মান্তিক দাঙ্গার কাহিনী।

সেই অগ্নি-পরীক্ষার বীভৎস আলোয় দেখি, তাদের প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতা। গীতালি বাসুদেব ব্যানার্জিকে ফাঁকি দিয়ে নিজের ছেলেকে পরের ছেলের পরিচয়ে ঘরে এনে তুলতে দ্বিধা করেনি। 'যেন শেষ পর্যন্ত বাসুদেবকেই তার ভয়। যে সমুদ্রে নিশ্চিত নিঃশেষ ঝাঁপ দেবে ভয় সে সমুদ্রকেই।' অন্যদিকে সুপ্রভাতের আত্ম-জিজ্ঞাসা—এই? এরই জন্যে এত? সোহিনীর ত তবু এখনও সম্ভাবনা আছে, জৈব অর্থেই আছে, সে মা হতে পারবে। কিন্তু সুপ্রভাত নিজে? সে নিঃসঙ্গ-নিঃশেষ। তাই দু'পক্ষেই ফাঁকির বেসাতি চলল। সোহিনী তার আপন জন নীলাদ্রির আসার তারিখ লুকোয়, সুপ্রভাত অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে থেকে সোহিনী-নীলাদ্রির আলাপ শোনে। শুধু তাই নয়, দাঙ্গা শুরু হলে সোহিনীকে বিপজ্জনক এলেকায় একা রেখে সুপ্রভাত ভবানীপুরের পৈতৃক বাসায় এসে উঠতে দ্বিধা করেনি। অতএব তাদের প্রেম রাহুগ্রস্ত। আর যে অতলস্পর্শী নিরাসক্ত বিদ্যাজীবী অসাধারণ পুরুষকে নলিনেশের মধ্যে পরমা দেখেছিল—জানা গেল, তিনিও উষসী গুহের কাহিনী লুকিয়ে এক মিথ্যা ছলনায় পরমাকে ঠকিয়েছেন। এবার কোন ছলে পরমাকে সরিয়ে দিতে পারলে তিনি বেঁচে যান। আর পরমা স্ত্রী রূপিণী উষসী গুহের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পরমাও আপন প্রেমের বীর্যে আর অশঙ্কিনী রইল না। অবশ্য আর্থিক চাপে তাদের প্রেমে ফাটল ধরেছিল আগেই। অন্যদিকে প্রেমের সমুদ্র বাসুদেবও গীতালির ছলনা ধরে ফেলেছে, তাই দাঙ্গার দিনে মিথ্যা অছিলায় গীতালির ছেলেকে বাড়িতে ফেলে যেতে সে দ্বিধা করেনি।

তারপর দাঙ্গা শান্ত হলে তাদের প্রেমের পরম উপলব্ধির সুযোগ এল। মাহবুবের মুখ থেকে পরমা নতুন করে শুনল তার স্বামী নলিনেশ মহৎ—স্পর্শমণির মতই খাঁটি। আর

থানায় গীতালির ছেলেকে দেখতে পেয়ে বাসুদেব ব্যাকুল হাত বাড়াল—'এবার আমার কাছে দাও।' সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় চোখে তাকাল গীতালি, ছেড়ে দিল ছেলেকে। অন্যদিকে সুপ্রভাতও দেখল অখণ্ড অস্পৃষ্ট সোহিনী। এমন কি সোহিনীর হাত ধরে মরণাপন্ন নীলাদ্রিকে হাসপাতালে দেখতে চলল সুপ্রভাত।

পরিশেষে অচিন্ত্যকুমারের তত্ত্বগত মন্তব্য : সে ক্ষণিকমলিন আলোতে (গ্রহণের আলোতে) চিনল পরস্পরকে, হল নতুন মুখচন্দ্রিকা। গ্রহণের স্পর্শ সরে যায় কিন্তু চাঁদ মরে না। শেষ হয় না রূপসী রাত্রির নিমন্ত্রণ।

অচিন্ত্যকুমারের নতুন উপন্যাসের এ কাহিনী পড়ে মনে হয়, প্রতিভাও মরে এবং তার আর্তনাদও অনেক দিন শোনা যায়। যেমন প্রেম মরে, কিন্তু তার কান্না মরে না। "রূপসী রাত্রি" প্রতিভার কান্না ছাড়া কিছু নয়। আসল কথা, রূপ যেমন যৌবনে একবার মাত্র ফল দিয়ে নিঃশেষ, তেমনি প্রতিভাও ওষধি মাত্র—জীবনের কোন বিশেষ পর্ব মাত্র তার সোনার ফসলের কাল। এর জন্যে দুঃখ হতে পারে, ক্ষোভ জাগা স্বাভাবিক, এমন কি অনুযোগও করা যেতে পারে—কিন্তু তার সত্য অস্বীকার উপায় নেই।

এ উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রমিছিল প্রশংসা দাবি করতে পারে না। লেখকমাত্রই গল্পের কথাবস্তু ও জীবন-উপাদান দুভাবে সংগ্রহ করেন—হয় জীবনের বই পড়ে, নয় কাগজের বই পড়ে। টমাস হার্ডি জীবনকে জেনেছিলেন তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করে—তাঁর জীবনানুভূতি বাস্তব ও অব্যবহিত—ওয়েসেক্সের মাটি ও সেই মাটির মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ থেকে উদ্ভূত। আর এই জীবনকে তিনি পেয়েছিলেন চিত্তবৃত্তিতে, মস্তিষ্কের মধ্যে নয়। মার্কিন সাহিত্যিক ও. হেনরী নিজের বিচিত্র জীবনে বহু নাগরিক মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন, তাদের জেনেছেন। আর কাগজের বই পড়ে জীবনকে পাওয়ার চেষ্টার উদাহরণও দুষ্প্রাপ্য নয়। ওয়েলসের উপন্যাসে বা শ-এর নাটকে যে চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হই, তা কি সোজাসুজি জীবন থেকে নেওয়া? তাঁরা সংসারে নর-নারী দেখেছেন নিশ্চয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দেখেছেন পুঁথির জগতে। শুধু তাই নয়, লাইব্রেরীর পরিবেশে তাঁরা জীবন অধ্যয়ন করেছেন, তাকে নিয়ে চিন্তা করেছেন—সেই অধ্যয়ন ও চিন্তার ফলে জীবনের যে abstraction লাভ করেছেন তারই ভিত্তিতে করেছেন নতুন জীবন নির্মাণ। কিন্তু দুঃখের কথা, অচিন্ত্যকুমার তাঁর উপন্যাসের বিষয় সংগ্রহ করেছেন না জীবনের বই থেকে, না কাগজের বই থেকে। প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে মোকাবিলা করেননি বলে অভিযোগ করছি না, জীবনকে নিয়ে কিছুমাত্র অধ্যয়ন ও চিন্তা করেননি বলেই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ। আদর্শ বা তত্ত্বের বেশ পরালেই কাহিনী বা চরিত্র গভীরতর তাৎপর্য লাভ করে না। তার জন্যে চাই সৎ জীবনজিজ্ঞাসা, অন্তর্ভেদী নির্মোহ দৃষ্টি, যে সমস্ত বাইরের ও ভেতরের কারণে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাঙে ও বদলায়—তার কার্যকারণ সূত্রের জ্ঞান, সমগ্র অস্তিত্বের পটে ব্যক্তি চৈতন্যের দ্বন্দ্ব ও সমস্যার অভিজ্ঞতা। এমনিতর জীবনবোধের অভাব অনেকের থাকে বলে তাঁরা আদর্শ বা তত্ত্বের রাজবেশে ভাবের ঘরে চুরি করে বসেন। অচিন্ত্যকুমারও তা-ই করেছেন। তাঁর উপন্যাসের তাত্ত্বিক বেশটা খুলে ফেলুন—দেখবেন তাতে ভাবালুতার বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁর ভাবালুতা সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের হাস্যকর চিত্রে।

"রূপসী রাত্রির" শিল্পরূপে "পরমপুরুষের" লিখনভঙ্গি স্মরণ করিয়ে দেয়। পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের মধ্যে লেখকের আত্মক্ষেপ ও শাস্ত্রব্যাখ্যাতার ভূমিকা গ্রহণ আপত্তিকর।

এই কথকতার ঢঙ ছাড়তে না পারলে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমারের সার্থক প্রত্যাবর্তন ঘটবে বলে মনে হয় না। তবে নিছক প্রেমের গল্প হিসেবে চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সুখপাঠ্য। মাঝে মাঝে 'প্রথম প্রেমের' ঝিলিক দেখা যায়, অচিন্ত্যকুমারের মুন্সিয়ানা ধরা পড়ে। চরিত্র-গুলির মধ্যে স্বয়ম্ভু গাঙুলির ক্ষণিক দীপ্তি চিত্তাকর্ষক। ভাষার ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমার অতুলনীয়।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

* রূপসী রাত্রি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য—পাঁচ টাকা।

সমালোচনা

Two Women *By* Alberto Moravia. Secker & Warburg. London. 18*s*.

আলবার্তো মোরাভিয়ার খ্যাতি এখন আর ইতালীতে সীমাবদ্ধ নেই, সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। আর য়ুরোপে যাঁরা খ্যাতিমান হন তাঁরা বিশ্বেও খ্যাতিমান। কাজেই সুদূর বাংলা-দেশেও যে আজকাল মোরাভিয়ার নাম সুপরিচিত সেটা বিস্ময়ের কিছু নয়।

কিন্তু শুনতে পাই বাংলাদেশে তাঁর খ্যাতির অন্যতম কারণ তাঁর লেখায় নারী পুরুষের সম্পর্কের খোলাখুলি বিবরণের প্রাধান্য। জিনিসটা নিষিদ্ধ বলেই নাকি যুবক-সমাজের কাছে বেশী লোভনীয়, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাঁরা মোরাভিয়াকে বিচার করেন তাঁরা তাঁর প্রতি সুবিচার করেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যৌন-কামনার কাল্পনিক পরিতৃপ্তি যোগানো যে সব লেখকের কাজ মোরাভিয়া ঠিক সে-জাতের লেখক নন।

আলোচ্য বইখানিতেও কিছু যৌন-সংক্রান্ত বিবরণ আছে বলে এ প্রসঙ্গে দু একটি কথা না বলে পারছি না। ঊনবিংশ শতকের লেখকরা সচেতন থাকতেন যে পাঠককে তাঁরা একটি গল্প শোনাচ্ছেন। আমরা সামাজিক আলাপ আলোচনার সময় যেমন একটা মুখোশ এঁটে শালীনতা বজায় রেখে কথা বলি, তাঁরাও তেমনি তাঁদের লেখাতেও শালীনতা বজায় রাখতেন। চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারেও মানুষের মনের যে মুখটা সমাজের দিকে ঘোরানো রয়েছে তাঁরা শুধু সেদিকটাকেই প্রকাশ করতেন। আধুনিক লেখক কিন্তু পাঠককে গল্প শোনান না। তিনি একান্তে বসে মানুষের গোপন মনে যে কাহিনী লেখা রয়েছে তার পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করেন। যেটুকু তিনি পাঠোদ্ধার করতে পারেন সেটুকুই তিনি লিপিবদ্ধ করেন। পাঠককে শোনানোর জন্য নয়। পাঠক যখন মানুষের মনের ঘটনা পড়তে চান তখন তিনি যাতে কিছুটা সাহায্য পান সেইজন্য। আধুনিক লেখক অভিভাবকত্বের দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিয়েছেন।

মানুষের গোপন মনের লজ্জা সরমের বালাই নেই। সে প্রসঙ্গের সামান্য মাত্র উল্লেখে আমরা লজ্জায় বা রাগে লাল হয়ে উঠি; আমাদের মন কিন্তু অনায়াসে সে প্রসঙ্গ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে, আর তার জন্য এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ বা অনুশোচনা বোধ করে না। যে-কথা আমরা মুখে উচ্চারণ করি না, তা কিন্তু জীবনে ঘটে। আর জীবনে যা ঘটে তা মনের উপর দাগ কাটে। কাজেই মানুষের মনের কারবারীর কাছে নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ বলে কোনো প্রসঙ্গ নেই।

নৈতিকতার প্রশ্ন তুললে আধুনিক লেখক বলবেন যে-নীতি এত সহজে ভেঙে যায় সে ঠুনকো নীতিতে কিছু ত্রুটি আছে। সমাজে একটা নীতির প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু নীতির কোনো শাশ্বত মাপকাঠি নেই। যে নীতি আমাদের প্রয়োজন, জ্ঞান-বৃদ্ধিতে সে নীতির কোনো ক্ষতি হবে না।

Two Women বইখানিতে মোরাভিয়া তাঁর পরিচিত পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। সাধারণতঃ সমাজ-বাস্তবের কোনো বৃহৎ পটভূমিকা অবলম্বন করে তিনি কাহিনী রচনা

করেন না। *The Woman of Rome*-এর নায়িকার চারপাশে কিছু লোকের ভিড় দেখা যায় বটে, কিন্তু নায়িকা মানসই তাঁর প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়, তাঁর *Conjugal Love* বা *Adolescents*-এ চরিত্রের ভিড় খুব কম। নায়ক বা নায়িকার মানসক্ষেত্র মন্থন করেই লেখক অত্যন্ত তীব্র নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন।

প্রেমে ব্যর্থতা বা বিবাহিত প্রেমে প্রতিদানের অভাব বা বয়ঃসন্ধিকালের তীব্র আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রভৃতি যে কোনো কারণে যে মানুষের মন সমাজের স্রোতের সঙ্গে নিজের সংগতি হারিয়ে ফেলেছে, সেই সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানস চিত্রণেই মোরাভিয়া বিশেষ পারদর্শী। সমাজ বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তি-মানসের ক্ষেত্রে এক দারুন অভিশাপ। সমাজ থেকে খাদ্য আহরণ না করে একটি মূলতঃ জীবন-বিরোধী চিন্তাই সে-মনের একমাত্র অবলম্বনীয় হয়ে ওঠে। এই আত্মকণ্ডুয়ন মোরাভিয়া তীব্র নাটকীয়তার মধ্যে চিত্রিত করতে পারেন। এই বিবরণ পাঠকের কাছেও এক অভিজ্ঞতা। পাঠক এমনভাবে সমাজ বিচ্ছিন্ন আত্মার যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্মক হয়ে ওঠেন যে যৌন ব্যাপারের আনুপূর্বিক বিবরণও কোনো যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে না। ভালবাসাই এই বিচ্ছিন্নতার থেকে মুক্তি দিতে পারে। মোরাভিয়ার বোধ হয় এই বক্তব্য। কিন্তু মোরাভিয়ার বক্তব্যের থেকে তিনি যে বিচ্ছিন্ন আত্মার গতি-প্রকৃতির বিবরণ দেন তার মূল্য বেশী।

এই হিসাবে মোরাভিয়ার লেখা পড়তে পড়তে টমাস মানের কথা মনে পড়ে। টমাস মানের *Death in Venice* বা *Magic Mountain* বইতে সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানসের আত্মরতিই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু জার্মানীর ভাববাদী আবহাওয়ায় পুষ্ট মানের কাছে এই বিচ্ছিন্নতা আত্মার অপমৃত্যু নয়, আত্মার পরিপূর্ণতা; ব্যক্তি-সত্তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা। আত্মরতির মধ্যে ব্যক্তি-মানসের চরম সার্থকতা। অবশ্য মানের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে দার্শনিক মনন রয়েছে, মোরাভিয়ার তা নেই। মোরাভিয়া ফ্রয়েডের অনুগামী।

কিন্তু *Two Women* বইতে মোরাভিয়া সমাজ বাস্তবের এক বৃহৎ অংশকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। অসামরিক জনতার উপর যুদ্ধ যে মানবতা-বিরোধী প্রভাব বিস্তার করে এ-বইতে তাই হল মোরাভিয়ার অনুসন্ধানের বিষয়। প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বীভৎস বিবরণ এখানে অনুপস্থিত বলে এ-বইকে যুদ্ধ-সম্পর্কিত বই বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু বলায় কোনো ক্ষতি আছে বলে মনে হয় না।

লেখক সেসিরা নামে এক দোকানদার গিন্নীর মুখ দিয়ে কাহিনীটি বিবৃত করেছেন। সে তার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। স্বামীকে সে ভালবাসত না, কিন্তু সংসারকে ভালবাসত, সংসারকে, স্বামীর দোকানকে এবং তার একমাত্র মেয়ে—জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রোসেটাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর সে নিজেই দোকান চালাত এবং যুদ্ধকালীন চোরাকারবারের সুযোগ নিয়ে প্রচুর রোজগারও করেছিল, কিন্তু রোমে দারুন খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়ায় যুদ্ধের স্থায়িত্বের সময়টুকু সে গ্রামাঞ্চলে কাটিয়ে দেবে বলে স্থির করে বেরিয়ে পড়ল। রোমের উত্তরাঞ্চলে এক পার্বত্য অঞ্চলে মা মেয়ে আশ্রয় নিল। সঙ্গে অর্থ ছিল তাই খাদ্যের স্বল্পতা সত্ত্বেও দিন চলে যেতে লাগল। এখানে এসে সে লক্ষ্য করল, যুদ্ধ কী করে মানুষের সমস্ত মানবীয় বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করে তার মধ্যেকার পাশব-বৃত্তি, লোভ আর ভয়কেই সর্বগ্রাসী করে তুলছে। স্নেহ প্রীতি ভুলে গিয়ে মানুষ পয়সা রোজগারে মন দিয়েছে, কারণ জীবনে যুদ্ধ তো বারবার আসবে না। তারা জানত না যে দেশে যখন খাদ্যাভাব ঘটে তখন পয়সায় প্রাণ বাঁচানো যায় না। এখানে এসে সেসিরা মাত্র একজন মানুষের সাক্ষাৎ পেল—

সে আইনের ছাত্র মিসেল। এই যুদ্ধ যে ফ্যাসিস্ট চক্রান্তের ফল, ফ্যাসিস্টতন্ত্র যে পুঁজি-বাদীদের একটা ষড়যন্ত্র, অত্যাচারিত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই যে প্রকৃত মানবতা আছে এবং তাদের চেষ্টাতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ফলেই যে বর্তমানের বিভীষিকা দূর হতে পারে—এসব কথা সে বিশ্বাস করে। সমস্ত মানুষের মধ্যে একমাত্র সে-ই ছিল লোভ এবং ভয়ের ঊর্ধ্বে এবং সে সর্বদাই লোকের উপকার করতে চাইতো। একদিন দুজন জার্মান সৈনিক এসে তার পিঠে রাইফেলের নল লাগিয়ে এক দুরাগম্য পার্বত্য অঞ্চলে পথ দেখানোর জন্য নিয়ে গেল। সেসিরার মন ভেঙে গেল। মিত্রপক্ষের জন্য সবাই অধীর আগ্রহে এতকাল দিন গুনছিল : কারণ মিত্রপক্ষ এলেই অভাব ঘুচবে বলে সকলের ধারণা। কাজেই মিত্রপক্ষ ইতালীতে অবতরণ করেছে জানতে পেরে সেসিরা মেয়েকে নিয়ে মিত্র সৈন্য অধিকৃত অঞ্চলে পালিয়ে গেল। সেখানে বোমা ফাটাফাটির বিভীষিকায় ক্লান্ত হয়ে তারা এক সৈন্যবাহী গাড়ির সাহায্য পেয়ে বাল্যজীবনের গ্রামের উদ্দেশ্যে আবার অগ্রসর হল। এসে দেখল, গ্রাম জনশূন্য। গ্রামবাসীরা পালিয়ে গেছে। সেখানে এক গির্জার মধ্যে কয়েকজন নিগ্রো সৈন্যের দ্বারা সিসেরার মেয়ে রোসেটা ধর্ষিতা হল। সিসেরা আশংকা করল যে কুমারীত্বের এই বীভৎস অমর্যাদার ফলে তার মেয়ের মন হয়তো একেবারে ভেঙে পড়বে। কিন্তু আশ্চর্য! সেই যে রোসেটা রক্তের স্বাদ পেল, তারপর আর তার পুরুষের সঙ্গ ছাড়া দিন চলে না। নির্বিচারে সে একের পর এক প্রণয়ীকে গ্রহণ করতে লাগল। দারুণ মর্মপীড়ায় সিসেরা মেয়েকে নিয়ে রোমে ফিরে যাওয়াই ঠিক করল। সঙ্গে থাকল রোসেটার এক প্রণয়ী। পথে আততায়ীদের হাতে সেই প্রণয়ী নিহত হল। সে নিহত হয়েছে দেখে সর্বপ্রথমেই সিসেরা তার কোটের গুপ্ত পকেটে লুকিয়ে রাখা টাকাটা আত্মসাৎ করল। পরক্ষণেই অবাক হয়ে সে আবিষ্কার করল, যুদ্ধের ফলে তার মেয়েই শুধু অধঃপতিতা হয়নি, সে নিজেও হয়েছে।

Two Women-এর কাহিনী সংক্ষেপে এই। মানুষের নৈতিক জীবনের উপর যুদ্ধ যে কত বড় বিভীষিকা লেখক তা অত্যন্ত বাস্তবভাবে উপস্থিত করেছেন। চরিত্র সৃষ্টিতেও লেখকের বাস্তব বোধ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেসিরা, রোসেটা, মিসেল, মিসেলের বাবা, যাঁর মতে মানুষ চালাক এবং বোকা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রভৃতির রূপায়ণে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বোপরি এই বইতে আমরা মোরাভিয়ার রাজনৈতিক মতামতের পরিচয় পাই। তিনি যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্টতন্ত্রের বিরোধী এবং সমাজ-তন্ত্রের প্রতি অনুরাগী।

তবু মোরাভিয়ার অন্যান্য বইয়ের মত এ-বই শিল্পগত পরিতৃপ্তি জাগায় না। গলসওয়াদী এবং বেনেট সম্পর্কে ভার্জিনিয়া উলফ্ যেমন বলেছেন, তেমনি করে বলতে ইচ্ছে করে মোরাভিয়া এক বিশেষ সময়কার বাস্তবের অনেক মাল-মশলা যোগাড় করেছেন, অনেক জড়বস্তুর ভারে বইখানা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু জীবন সেখানে অনুপস্থিত। লেখক যে-সব চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন তারা নিঃসন্দেহে বাস্তব-সম্মত। কিন্তু মানুষের মনের যে মুখটা শুধু সমাজের দিকে তাকিয়ে আছে আমরা শুধু তারই পরিচয় পাচ্ছি। মনের ব্যাপক দিগন্তের কোনো সন্ধান পাই না বলে এই সরল রেখাত্মক চিত্রায়ণ আমাদের কাছে যান্ত্রিক বলে মনে হয়। সেসিরা এবং রোসেটার রূপান্তর দারুণ নাটকীয় হলেও স্বাভাবিক এবং মনস্তত্বসম্মত। কিন্তু বাইরে থেকে দেখা, মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় নয়। মানুষের সরল রেখাত্মক চিত্রও রসাত্মক হয়ে ওঠে, যদি সেই চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে জীবনের কতকগুলো মূল্যবোধ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-বইতে মিসেলের মুখ দিয়ে লেখক সমাজ-

তান্ত্রিক মূল্যের কথা বলেছেন, কিন্তু সে মূল্যও কোনো দুর্বার উপলব্ধিতে রূপায়িত হয়ে ওঠেনি।

Two Women-এ আধুনিক কালের এক দারুণ ট্র্যাজেডী বর্ণিত হয়েছে। ট্র্যাজেডীও মানুষকে রসসিক্ত করে, কারণ ট্র্যাজেডী আমাদের দুঃস্থ অধঃপতিত মানুষকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরতে প্ররোচিত করে। মানুষের প্রতি সেই তীব্র সহানুভূতিবোধ লেখক জাগিয়ে তুলতে পারেন নি।

একজন দোকানদারের মুখ দিয়ে কাহিনী বিবৃত করার ফলে লেখক একটু অসুবিধায় পড়েছেন। দোকানদারের হিসাবী মন মানুষের চরিত্রকেও একটা খুব সরল হিসাবের সাহায্যে বিচার করতে পারে। সেই নিরুত্তেজ নির্মম হিসাববোধই লেখক আমাদের সামনে উপস্থিত করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই জীবনের অন্তরঙ্গ নিবিড় পরিচয় আমরা পাই না।

অনেক সময়ে অনুভব করা যায় যে যুদ্ধকালীন বাস্তবের একটা বিশেষ দিককে উপস্থিত করার জন্যই লেখক কোনো ঘটনা বা চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন। যেমন দুজন পলাতক সৈন্যের সঙ্গে সিসেরা, রোসেটা এবং মিসেলের সাক্ষাতকার। লেখকের নিপুণ বাস্তব বিশ্লেষণ প্রশংসনীয়। কিন্তু নিছক বাস্তবতাই তো শিল্পকর্ম নয়।

সিসেরা, রোসেটা এবং মিসেল—এরা সবাই কিন্তু জীবন-বিচ্ছিন্ন। এদের চিত্রায়নের মধ্যে পুরানো মোরাভিয়ার পরিচয় রয়েছে। এরা জীবন-বিচ্ছিন্ন বটে, কিন্তু জীবনকে বিশ্লেষণ করছে বৈজ্ঞানিকের মত। এই দূরত্বের অনুভূতিটাই বইটিতে অনুভব করা যায়।

অচ্যুত গোস্বামী

Writers at Work: The Paris Review Interviews. Secker & Warburg, London. 21*s*.

লেখকরা কি করে লেখেন—এই ধরনের আলোচনা উঠলে পেশাদার সমালোচকসকল নিজ নিজ মতামত পেশ করতে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। বিশুদ্ধ প্রেরণার উকীল, ঐশী ক্ষমতার ধ্বজাধারী, সর্বশাস্ত্র বিশারদ বিচক্ষণ ভাষ্যকার—তাঁদের বক্তব্য বেঁধেছেঁদে এমনভাবে খাড়া করার চেষ্টা করেন যেন তাতে ছুঁচ গলাবার সুযোগ না থাকে। ফল যে সব সময়ে আশানুরূপ হয় না সাধু পাঠকদের সে কথা অবিদিত নয়।

উপরোক্ত ভূমিকা দেখে কেউ যদি মনে করেন আমরা সমালোচকদের কেবল নিন্দে করছি তাহলে ব্যাখ্যাটা ঠিক হবে না। একথা অবশ্যই শিরোধার্য যে সমালোচনা সমালোচকদেরই কাজ। আর মতের বিভিন্নতা শুধু স্বাভাবিক নয় কাম্যও বটে। বিভিন্নমুখী চিন্তার আদান-প্রদান, নানান ভাবনা-ধারণার-সংঘাতের ফলেই লোকেদের ভুলভ্রান্তি দূর হয়, চিন্তার প্রসারতা আসে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়।

আমরা যা বলতে চাইছি তা হল এই যে সময়ে সময়ে সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্যিকদেরও মতামত নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণত এদেশে ও বিদেশে সমালোচনার ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটার অভাব দেখা যায়। কথাটার যাথার্থ্য যে কোনো সাহিত্য-পত্রিকা খুলে দেখলেই যাচাই করা যাবে। আমাদের মতে সাহিত্যিকদের সাহিত্য সম্বন্ধে বলবার দাবী

আছে এবং প্রয়োজনীয়তা আছে যেমন আছে শিল্পীদের শিল্প সম্বন্ধে। তাতে সমালোচনায় ভারসাম্য আসে। লেখক ও শিল্পীরা মাঝে মাঝে এমন গভীর ও সমুচিত সত্য বলতে পারেন যা লেখা বা আঁকার অভিজ্ঞতা প্রসূত, যা পাঠক বা সমালোচক যতই বুদ্ধিমান হোন না কেন তাঁদের সাধ্যাতীত। তা ছাড়া আরো একটা বড় কথা হল সাহিত্যিক বা শিল্পীদের মতামত সমালোচকদের লেখার চেয়ে সাধারণত ঢের বেশী সুপাঠ্য। এর প্রমাণ যে বইটি আমরা সমালোচনা করছি—*Writers at Work*. বইটি সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে, এর ইতিবৃত্ত দুচার কথায় বলা প্রয়োজন। প্যারিস থেকে প্রকাশিত মার্কিন সাহিত্য পত্রিকা "প্যারিস রিভিউ" পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী তাঁদের পত্রিকার তরফ থেকে বিভিন্ন দেশের বড় বড় লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেই সাক্ষাতকারের বিবরণী তাঁদের কাগজে ছাপান। এই বইটি সেই সব লেখার সংকলন। যে ষোলজন লেখকের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইংলণ্ডের ফরস্টার, জয়েস ক্যারী ও এ্যানগ্যাস উইলসন; ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক, সিমেনন ও ফ্রাঁসোয়াজ সাঁগা; ইতালীর আলবার্তো মোরাভিয়া; অ্যামেরিকার ফকনার, থারবার, থর্নটন ওয়াইলডার, ট্রুম্যান ক্যাপোট, ডরোথী পারকার, রবার্ট পেন ওয়ারেন, ফ্রাঙ্ক ও' কোনোর, উইলিয়াম স্টাইরন ও নেলসন অ্যালগ্রেণ। এখানে বলা প্রয়োজন যে প্রত্যেক লেখকের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। যাঁরা রিপোর্টারের কাজ করেন তাঁরা লেখকদের লেখার সঙ্গে সুপরিচিত। প্রথমে তাঁরা লেখকদের কাছে প্রশ্নের তালিকা পাঠান এবং লেখকরা সেই প্রশ্ন পড়ে ভেবে চিন্তে তৈরি হলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করা হয়। পরে লেখকদের জবাব লিপিবদ্ধ করে ছাপা হয়।

যে কোনো কাজে নাবতে হলে উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাতে উদ্দেশ্য হাঁসিল করার কায়দাগুলো সহজে বেরিয়ে পড়ে, কাজ গোছালোভাবে করা যায়। *Writers at Work* বইটির বৈশিষ্ট্য এইখানে।

বইয়ের উদ্যোক্তারা লেখকদের কাছ থেকে আপ্তবাক্য নয় মোটামোটা কথা জানতে চেয়েছেন। যেমন তাঁরা কি করে লেখা শুরু করেন, তাঁরা কি ভাবে ও কোথা থেকে লেখার মালমশলা জোগাড় করেন, তাঁরা লেখার শুরু থেকে লেখা শেষ করার মধ্যে কি কি ধাপ অতিক্রম করেন ইত্যাদি। প্রসঙ্গত আরো নানা কথা এসে গেছে—লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি ঘর সংসার ও পরিবেশের কথা. তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা, মূল্য-বোধ, নীতিজ্ঞান, তাঁদের সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁদের জীবনদর্শন।

এই ষোলজন লেখক-লেখিকার জবাবগুলো ভালোভাবে পড়লে দেখা যাবে যদিও বয়েস, ধর্ম, শিক্ষাদীক্ষা, রাজনীতিক মতামত, বংশের ধারা, পরিবেশ ইত্যাদির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে তবুও কতকগুলো মূল ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মিল পাওয়া যায়। এই মিলগুলোকে জড়ো করলে গল্প বা উপন্যাস লেখক-এর একটা চেহারা দাঁড়ায় যার কোনো বিশেষ অবয়ব নেই, বয়েস নেই, জাত নেই, দেশ নেই।

এ বইয়ে দেখা যায় সাধারণত গল্প লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চারটে ধাপ আছে। প্রথম হল গল্পটা মাথায় আসা। তারপর হল তা নিয়ে ভাবা। এই ভাবনা-চিন্তার ফলে গল্পের মোটা চেহারাটা বেরিয়ে আসে। তারপর গল্পের প্রথম খসড়া এবং সব শেষে হল লেখা কেটেকুটে, অদলবদল করে ঘসেমেজে গল্প শেষ করা। উপন্যাস লেখকদের সঙ্গে ছোট গল্প লেখকদের একটা বড় তফাৎ আছে। ছোট গল্প লেখকরা সাধারণত গল্পের শুরু থেকে শেষ অবধি প্রায় একদানে ছকে ফেলেন। কিন্তু উপন্যাস লেখকদের বেলায় এ-কথাটা

খাটে না। তাঁরা যখন শুরু করেন তখন মোটামুটি একটা ভেবে নেন যে গল্পটা কিভাবে এগোবে, কোন দিকে যাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উপন্যাসের গতি ছক ছেড়ে অন্যদিকে চলে এবং যা ভাবা যায় তা না হয়ে অন্য চেহারা নেয়। গল্প লেখক আর উপন্যাস লেখকের মধ্যে তফাৎটা যখন ট্রুম্যান ক্যাপোট এবং সিমেননকে তুলনা করলে পরিষ্কার হয়ে যায়। ছোট-গল্প লিখিয়ে ক্যাপোট কাগজে কলম ঠেকানোর আগে গল্পটা ঠিক কি ভাবে শেষ হবে তা পরিষ্কার করে মাথায় ছকে নেন। অন্যভাবে যে ভালো লেখা যায় একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। অপর দিকে সিমেনন বলেন যে তিনি টাকা না পেলেও হয়ত লিখবেন কিন্তু যদি তিনি উপন্যাস লেখার শুরুতেই উপন্যাস কি করে শেষ হবে জানতে পারেন তাহলে তিনি আর কলম ধরবেন না। ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক বলেন তিনি যখন উপন্যাস শুরু করেন তখন জানেন না যে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে। মোরাভিয়ার কোনো উপন্যাসই আগে থেকে বাঁধা থাকে না। ফরস্টার একটা কাঠামো খাড়া করেন কিন্তু লিখতে লিখতে তা তিনি অনবরত বদলান। উপরোক্ত কথাগুলো খুব নতুন নয়। সেদিক থেকে আলোচ্য বইয়ের কিছু বিরাট গুরুত্ব না থাকতে পারে। যেখানে এ বইয়ের আসল মজা সেটা হল বিভিন্ন লেখকদের নিজেদের মুখ থেকে তাঁদের লেখার কায়দার নানা রকম খুঁটিনাটি খবর। যেমন অনেকের মাথায় গল্প আসে চোখে দেখে—হয়ত কারুর মুখ হয়ত একটা ঘটনা। জয়েস ক্যারীর একটি প্রসিদ্ধ গল্পের শুরু হয় একটি মেয়ের কপালের রেখা দেখে। কারুর কানটা বেশি তৈরি যেমন ও' কনোর বা ডরোথী পার্কার। তাঁদের কল্পনার অনেক সময় শুরু হয় হঠাৎ শোনা একটা কথা থেকে। অবশ্য অধিকাংশ লেখককেই চোখে দেখা ও কানে শোনা দুটোই গল্প ফাঁদতে সাহায্য করে। কারুর কারুর মাথায় গল্প বা উপন্যাসের ছায়া এলে তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলেন যেমন জয়েস ক্যারী বা সিমেনন। আবার অনেকে আছেন যাঁদের গল্পের দানাটা নিয়ে হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস ভাবেন। যেমন ফ্র্যাঙ্ক ও' কনোর, এ্যানগ্যাস উইলসন, রবার্ট পেন ওয়ারেন, জেমস থারবার। আর সে ভাবনাটা কারুর কারুর মাথায় সর্বক্ষণ ভূতের মতন চেপে থাকে। খাওয়ার টেবিলে থারবারের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে তার স্ত্রী প্রায়ই বলেন : *'Dammit, Thurber! Stop writing.'*

গল্পটা লেখার সময়ে অনেকে প্রথমে হু হু করে লিখে ফেলেন যেমন ডরোথী ক্যানফিল্ড ফিসার (ইনি অবশ্য বইয়ে নেই) সিমেনন, ও' কনোর ও মোপাসাঁও তাই করতেন। এ'রা প্রথম খসড়ায় যা মাথায় আসে তাই লিখে যান যাতে নানান বাজে কথার মধ্যে গল্পের মোটামুটি একটা চেহারা তৈরি হয়ে যায়। তারপর তাঁরা এক-মেটে, দো-মেটে, তিন-মেটে ইত্যাদি করে গল্পটাকে শেষ করেন। আবার অনেকে আছেন যাঁরা প্রত্যেক লাইন লিখে বদলাতে বদলাতে এগোন যেমন উইলিয়াম স্টাইরণ। লেখার অদল-বদলের ব্যাপারে একধারে দেখা যায় থারবারের মতন লেখক যাঁরা তাদের লেখা হরদম বদলান। একটা গল্প থারবার কুড়িবার নতুন করে লেখেন। অন্যদিকে সিমেনন ও ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁ। সিমেনন-এর উপন্যাস লিখতে লাগে তিন হপ্তা, মাজতে ঘসতে তিন দিন। সাগাঁর প্রথম আর শেষ খসড়ার মধ্যে খুব বেশি তফাৎ থাকে না।

অধিকাংশ লেখকই দিনে তিন চার ঘণ্টা লেখেন এবং মাটি কোপানো বা কাঠ কাটার মতন হাতের ব্যবহার এ'দের লেখার অপরিহার্য অঙ্গ। এক সময় জখমের ফলে হেমিংওয়ের ডান হাত পঙ্গু হয়ে যাবার ভয় দেখা দেয়। তখন তাঁর মনে হয় হয়ত তাঁর সাহিত্য রচনা বন্ধ

করে দিতে হবে। থারবারের যখন কিছুদিন আগে চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে আসে তখন তাঁকে কষ্ট করে 'ডিকটেট' করে গল্প লিখতে শিখতে হয়। ডিক্টেশান দিয়ে গল্প বা উপন্যাস লেখার রেওয়াজ প্রায় নেই বললেই চলে।

লেখার সময় আবার লেখকদের নানা রকমের সংস্কার আছে। কিপলিং এক জায়গায় বলেছেন যে তিনি ঘোর কালো কালি আর খুব ভালো কাগজ ছাড়া লিখতে পারতেন না। অ্যানগাস উইলসন কখনও যে নভেল লিখছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন না। ট্রুম্যান ক্যাপোট হলদে গোলাপের ভক্ত কিন্তু লেখার সময় টেবিলে হলদে গোলাপ রাখতে দেন না।

পরিশেষে বলা দরকার যে কজন লেখককে নিয়ে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে তাদের প্রায় প্রত্যেকের কাছেই লেখা জিনিসটা আহ্লাদজনক। 'সৃজনের গর্ভযন্ত্রণা' কথাটা সমালোচকেরা বহুল ব্যবহার করলেও এঁদের কাছে অর্থহীন।

Writers at Work-এ ষোলটি লেখার মধ্যে ফরস্টার ও মরিয়াকের সঙ্গে আলোচনা আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান, থারবার-এর বক্তব্য সবচেয়ে মজার ও মোরাভিয়ার কথাবার্তা সবচেয়ে উত্তেজক বলে মনে হয়েছে। অ-মার্কিন পাঠকদের কাছে *The Man with the Golden Arm*-এর লেখক নেলসন অ্যালগ্রেন ও *Lie Down in Darkness*-এর লেখক উইলিয়াম স্টাইরনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী একটু বেশী বিশদ বলে মনে হয়। ফকনার, থারবার ও ট্রুম্যান ক্যাপোট ছাড়া অন্যান্য মার্কিন লেখকদের বাদ দিলে ক্ষতি হত না। সেই জায়গায় আমেরিকার হেমিংওয়ে ও নাট্যকার আর্থার মিলার, ইংরাজ-লেখক গ্র্যাহাম গ্রীন, ফরাসী আন্দ্রে মারলোঁ প্রভৃতি জাত লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করলে বইটির কদর বাড়তো, গুরুত্ব বাড়তো ও নামের সার্থকতা হত। সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে দেশ-প্রেমজনিত পক্ষপাতিত্ব মহাপাপ।

দোষ ত্রুটি স্বত্বেও *Writers at Work* প্রকাশ করে পাঠকদের সঙ্গে সাহিত্যিকদের লেখার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় করানোর জন্য "প্যারিস রিভিউ" পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী আমাদের ধন্যবাদার্হ।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

অমিল থেকে মিলে— মণীন্দ্র রায়। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। মূল্য ১·৫০ ন.প।

কবিদের মধ্যে জাতিভেদের কথা পাঠকের বিবেচ্য। সে-বিষয়ে কবিসত্তার সত্যিই কিছু কি করণীয় আছে? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এবং গোবিন্দচন্দ্র দাশ, মধুসূদন এবং মানকুমারী বসু— অথবা এই রকম সুদূর-ব্যবহিত কবি-প্রকৃতির উদাহরণ তুলে যদি এই প্রশ্ন করা যায় যে, এইসব যুগলের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপন ব্যক্তিগত কবিত্বস্পৃহাতে অন্যের তুলনায় কতো কম বা বেশি ছিলেন, তাহলে জবাব দিতে দেরি হবে। বোধ হয় নিরুত্তর থাকাই শ্রেয়। কারণ, কবি-খ্যাতির আগ্রহের দিক থেকে কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই, কবিমাত্রেই সে-কথা জানেন।

কিন্তু তবু প্রভেদ থেকে যায়। একজন এগিয়ে যান ব্যর্থতা থেকে সফলতার দিকে;

অন্যজন ক্রমশ পেছিয়ে পড়েন। একজনের মন জেগে ওঠে সূক্ষ্মতা থেকে আরো সূক্ষ্মতার দিকে,—সাফল্য থেকে আরো সাফল্যের চূড়ায়; অন্যজন সে-তুলনায় জাগেন না। একজনের আবেদন আর-একজনের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও বেশ খানিকটা বেশি পরিমাণে পাঠকচিত্তক্ষেত্র অধিকার করে বসে!

আমাদের সাম্প্রতিক কাব্যানুরাগীদের মনে মণীন্দ্র রায় ঠিক কোন্ পর্যায়ে অথবা প্রসিদ্ধির কোন্ আসনে অধিষ্ঠিত, সে-প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, বাংলা কবিতার বর্তমান সময়টাই অনতিশীর্ষবর্তী বহুজনের প্রয়াসে সমৃদ্ধ। তিনি তাঁদেরই একজন। আটত্রিশটি কবিতার সংগ্রহ এই নতুন বইখানির শেষ কবিতাটির নাম অনুসারেই তিনি এই সংকলনের নাম রেখেছেন। তাতে বলা হয়েছে—

অমিল অনেক, সে কি আমিও জানি না?
এ প্রায় ছাত্রের কাছে পৃথিবীর কমলালেবুকে
আধাআধি ভাঙার প্রয়াস।
অথচ গভীর প্রেমে আকাশের বুকে বাঁধা তবু
সূর্য থেকে ঘাস!

মনে পড়ে, গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ স্মরণ করতেন। আনন্দের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টি পরম ঐক্যে লীন হয়ে আছে। এই সেদিন রবীন্দ্র-সান্নিধ্য-সমৃদ্ধ অমিয় চক্রবর্তী লিখেছিলেন—

'তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।'

বিরোধ থেকে সমন্বয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। মণীন্দ্র রায় স্বাস্থ্যবান পুরুষ; তিনি বয়সে এখন ঠিক চল্লিশ (জন্ম ১৯১৯)। কবিদের বাইরের স্বাস্থ্যভঙ্গ অবলম্বন করেই তাঁদের মনে আধ্যাত্মিকতা দেখা দেয়, একথা যাঁরা জোর করে বলবার চেষ্টা করেন, মণীন্দ্র রায়-ই তাঁদের অনুচিত ধারণার প্রবল প্রতিবাদ—বিশেষত 'অমিল থেকে মিলে' গ্রন্থনামটি মনে রাখবার মতো। তাঁর এ-বইয়ে এই শুভ পরিবর্তনের চিহ্ন শ্রদ্ধার্হ।

প্রথম কবিতার নাম 'আনন্দ, এবং আনন্দ'; তাতে তিনি বলতে চেয়েছেন যে আনন্দবাদে তাঁর স্বাক্ষর কোনো সহজিয়া ব্যাকুলতা-প্রসূত নয়; তিনি জানেন—

তবু বৃন্দাবনে জেনো থাকে তারি নাম
যে কৃষ্ণ, যে সয় জ্বালা। বাকী সব দাম-বসুদাম।

দ্বিতীয় কবিতা 'অন্য আকাশ'-এর শেষ লাইনে তিনি জানিয়েছেন—

যদি সে আকাশ পাই, মুখ দেখি প্রেমের দর্পণে।

বইখানি শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করে তিনি হয়তো তারাশঙ্কর-বাবুর আত্মিক প্রবণতার প্রতি এইসূত্রে তাঁর সাম্প্রতিক কবি-মানসের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। সমস্ত মিলিয়ে দেখলে "অমিল থেকে মিল"-এর মধ্যে চমৎকার একটি পরিকল্পনা চোখে পড়ে।

আঙ্গিক এবং পরিকল্পনার দিকে মণীন্দ্র রায়ের মনোযোগ উল্লেখযোগ্য। পতঙ্গ ও পশু-পক্ষীর রূপক তাঁর এই কবিতা-সংগ্রহের মধ্যে প্রায়ই দেখা দেয়। যথার্থ জীবনবোধ জাগলে,—মানুষের মন নিরভিমান হলে ধার-করা 'ময়ূরপুচ্ছ' খুলে যায়; তবুও হয়তো—

দ্বিধা খরগোশের চোখে
শেয়ালের দাঁত হয়ে জ্বলে...!

'যদি এ জীবনে ডুবি' লেখাটির মধ্যে এইসব উক্তির পরে তিনি খেদ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে—

মন যে উপোশী আজ। অমৃতের থালা
কোথাও মেলেনি এ সংসারে।
অথচ রাত্রির বনে ভালুকেও শুনি
মৌচাকে মাতাল, ভোলে মক্ষিকার জ্বালা।

পশু-পক্ষী-পতঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর মনোযোগের উদাহরণ ছাড়া এই লেখাটির মধ্যে আরো এক বিশেষ দিকের ছায়া পড়েছে। এই ধরনের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর অমিল-বোধ এখনো পুরোপুরি কাটেনি, তাঁর পুরোনো মনোভঙ্গি এখনো দেখা দিচ্ছে! 'মহাদেবের পটের প্রতি' নামে আর-একটি লেখার মধ্যে তিনি প্রশ্ন করেছেন—

প্রভু, এখনো কি হয়নি সমাধা
সময়ের দিনরাত্রি—ডোরাকাটা বাঘছালে বসে
জীবনের ইস্কুল পালানো? দেখ, কাঁদে-যে শিশুরা,
গৃহিণী কপাল কোটে স্বয়ংবরা বিয়ের আপশোষে
ভিক্ষার জটিল পথে ঘুরে ঘুরে ষাঁড় হল বুড়া!

'সে যদি এখনি ডাকে'-রচনার মধ্যে তাঁকে বলতে হয়েছে—

কে জানত নতুন এত কঠিনা ঈশ্বরী

এবং আবার বলতে হয়েছে—

নতুন নাটকে
এখনো মানিয়ে যাইনি। পাদপ্রদীপের সামনে তাই
উদ্ভট ভাঁড়ের মতো পদক্ষেপ অনিশ্চিত, বোকা,
এবং করুণ!

এই দুঃখ, নৈরাশ্য, ব্যর্থতার কথা সত্ত্বেও 'প্রতিশ্রুতি'-র মতন কবিতা আছে এ-বইয়ে,—যাতে তিনি বলতে পেরেছেন—

জানি যদিও অবশ্য
গহনার নৌকো চলে নিরাপদ একই ঘাটে ঘাটে,
কলুর বদল ঘোরে ইচ্ছাহীন পথে,
তবুও জেলেরা দেখ মাছের সন্ধানে—
উধাও নদীর মুখে লোনাজল আক্রমণ করে,
তবু অনভিজ্ঞ যুবা প্রেয়সীর কানে
জটিল কামনা দিয়ে প্রণয়ের ইমারত গড়ে।
এ জীবন প্রত্যহের প্রতি মুহূর্তের আবিষ্কার।

কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিকতা ছাড়া বক্তব্যের দিক থেকে যদিচ এ-বইয়ে মণীন্দ্র রায়ের বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্যের দাবি নেই, তবু তাঁর প্রয়াসের সততা আছে। প্রধানত শব্দ, ছন্দ এবং চিত্ররূপের কৌশলেই তাঁর অভিনিবেশ। 'ভাষা তার বোবা' লেখাটি সে-দিক থেকে স্মরণীয়। তাতে স্বগতোক্তির সুরে তিনি বলেছেন বটে—'আমি মধ্যশতকের দুর্ভাগ্য প্রেমিক', কিন্তু সেই বাচনরীতির মধ্যে চমক না-থাক, কায়দা আছে—

শুধু ভিড়, ক্লান্তি, স্নায়ুর লড়াই—
দুঃস্বপ্নের হিজিবিজি। এখানে যে অন্দরমহল
মেলেনা এখনো। তাই প্রেম আজো অন্ধকারে-ডোবা
মহেঞ্জোদারোর লিপি : ভাষা তার অপঠিত, বোবা।

তাঁর 'ধুনোঅন্ধ দালানেও বাজে মত্ত ঢাকীর তেহাই' ('যদি বন্ধু, পর হতে') কিংবা 'গাঁদা ও দোপাটি (যদি ফোটে!)/বিবাহিতা স্ত্রীর মতো মুহূর্তে আপন হয়ে ওঠে' ('শোনো, তবে শোনো') ইত্যাদি উক্তির মধ্যে সেই জাতের শব্দ ও সুরগত কায়দা দেখা যায় যার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে বিষ্ণু দের কবিতাবলীতে। বন্ধনী-চিহ্ন অনেকের মতন তিনিও ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। আধুনিক অন্যান্য অনেকের মতোই তিনিও জানেন—

দারুণ ভয়ের বৃত্তে ঘুরে চলে দিন।
অজগর-চোখে বাঁধা হরিণের স্তব্ধ নিরুপায়ে
ঘিরে আসে সময়ের ফাঁদ।

এবং তাঁর এইসব মনোগত লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ নির্বাচনের রুচি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। 'আগে কহো আর'-এর 'নৌকোর ডহরে' কথা দুটি চিত্তাকর্ষক সমাবেশের নমুনা। এবং হাতী, চড়ুই, গাধা, হরিণ, ষাঁড়, মৌমাছি, খরগোশ ইত্যাদি প্রাণীর ভাবরূপের অনুষঙ্গ ঠিক এতো বেশি পরিমাণে মণীন্দ্র রায় আগে কখনো ব্যবহার করেননি।

হরপ্রসাদ মিত্র